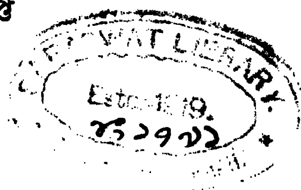
শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত



কমলা পাব্‌লিশিং হাউস
২৭ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক - শ্রীপাঁচুগোপাল দাস
কমলা পাবলিশিং হাউস
২৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম : এক টাকা

প্রিন্টার - শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

উৎপৎস্যতে জগতি কোঽপি সমানধর্ম্মা *
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।

(ভবভূতি)

* সমানধর্ম্মাকে দিলাম।

১ম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪২

শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী

অনেক বাজে আপত্তি আর পরিহার্য্য ঝঞ্ঝাটের পর শশাঙ্কশেখর গুপ্ত পুনরায় বিবাহ করিল।

শশাঙ্কের প্রথমা স্ত্রী ভোলাদাসী দেবী পিত্রালয়ে থাকিতেন—সেখানেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন্। ভোলাদাসীর পরমায়ু যথার্থই শেষ হইয়াছিল, কি আরো কিছুদিন তিনি বাঁচিলে বাঁচিতে পারিতেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত; কিন্তু ভোলাদাসীর মা সে তর্ক তুলিতেই দিলেন না; তিনি বড়াই করিতে লাগিলেন ইহাই বলিয়া যে, "মা আমার সতী-লক্ষ্মী ছিল, ডাক্তারে তার গা ছুঁলে না।" শশাঙ্ক শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এই পরপুরুষস্পর্শদোষহীন অটুট সতীত্বের ধারণা সমর্থন করিল না, করিল অসহযোগ এবং শ্বশুর-বাড়ীর সংস্পর্শ অবিলম্বে একেবারেই ত্যাগ করিয়া বাজারে আসিয়া বসিল—অর্থাৎ শ্বশুরান্নে থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় খুলিল। শিব তাহাকে শক্তি দিলেন।

যদি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় ছিল তবে শশাঙ্ক চাকুরীর চেষ্টা কেন করিতেছিল? কিম্বা যদি চাকুরীর চেষ্টাই সে করিবে তবে পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া অতীব জটিল দুরধিগম্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সে আয়ত্ত করিয়াছিল কেন?

সে আলাদা কথা।

২

অবিলম্বেই দেখা গেল, শশাঙ্ক কবিরাজের অন্তরস্থ বন্ধুবর্গের মধ্যে দুইটি বিষয়ে একেবারে মতভেদ নাই :

প্রথমতঃ, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে নূতন ও পুরাতন কঠিন রোগেও স্নিগ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যথার্থ ফলপ্রদ—উগ্রবীর্য্য বিলাতি ঔষধ নহে—

দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং মহাদেব রাবণকে যে স্বনামধন্য মোদক স্বহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই ক্ষুধাবর্দ্ধক ; আর, শশাঙ্ক কবিরাজের প্রস্তুত সেই মোদক বাজারের ছয় টাকা সেরের কৃত্রিম পান্‌সে জিনিষ নহে।

ক্ষুধাবৃদ্ধির আনন্দে বসুধাকে কুটুম্বিতার চোখে দেখিতে দেখিতে শশাঙ্ক কবিরাজের বিশেষ নিভৃত বন্ধু কার্ত্তিক একদিন প্রস্তাব করিল যে, নূতন কম্পজ্বরেও যখন কবিরাজের খোঁজ পড়িতেছে তখন আর ইতস্ততঃ না করিয়া নূতন করিয়া সংসার-পত্তন করা শশাঙ্কের উচিত।

ইহাতে শশাঙ্ক কলরব করিয়া খানিক হাসিল…তারপর বলিল,—বিয়ে কর্‌তে আমার ষোল-আনা ইচ্ছে রয়েছে ; না কর্‌লে চল্‌বেই না—খাবো কি! আমার এই বয়সে কারো কারো একবার বিয়েই হয় না…মোটে ছাব্বিশ চল্‌ছে ; কিন্তু গ্রহের কোপে আমাকে একবারের স্থলে দু'বার কর্‌তে হ'ল। কিন্তু—

তারপর স্বর নামাইয়া বলিল, "বাস যে সর্পপুরীতে!"—

বলিয়া বহুপূর্ব্বে কথিত কুপিত গ্রহের উদ্দেশে হাত তুলিয়া একটি প্রণাম ত্যাগ করিল।

—ঐ পক্ষের শ্বশুরদের কথা বল্‌ছ ?

—হ্যাঁগো। শ্বশুর বুড়ো বা পথে আছে ; কিন্তু সম্বন্ধীটার সুপথ কুপথ জ্ঞান নেই। খামখাই বলে কি না দেখে' নেব।... একদিন যাঁদের মা বলেছি বাবা বলেছি তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমি চাইনে—কিন্তু থাকতে হবে সাবধানে—আছিও তাই। বলিয়া শশাঙ্ক সুচতুর মুখ বাড়াইয়া রাস্তার উজান ভাটি দুটি দিক্ অতিশয় সাবধানতার সহিত দেখিয়া লইল।

কার্ত্তিক প্রশ্ন করিল,—গয়নাগুলো দিলে ?

শশাঙ্ক চুপি চুপি বলিল,—চেয়েছিলাম বলেই ত' সম্বন্ধী...ও আলোচনা না-ই করলে। কিছুদিন যাক্, আপনিই দেবে।

—আর দিয়েছে! বলিয়া পরম হিতৈষী কার্ত্তিক নিরুদ্দেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলিয়া মুখ তিক্ত করিয়া তুলিল।

শশাঙ্ক বলিল,—অম্বল হচ্ছে রোজ।

—হিঙ্গাষ্টক্ একমাত্রা খাওনা কেন রোজ!

কবিরাজের প্রদত্ত জ্ঞানকণা কবিরাজের উপরেই প্রয়োগ করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কার্ত্তিক কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল...

তারপর বলিল,—হবে না! রোজ সেদ্ধ পোড়া খেলে স্বয়ং ব্রহ্মার অম্বল হ'তে বাধ্য...তুমি ত' তুমি!

আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে ব্রহ্মার কিছু সংশ্রব আছে—যথা, চতুর্ম্মুখ (লাল), চতুর্ম্মুখ (কালো)—ইহাই স্মরণ করিয়া শশাঙ্ক ব্রহ্মার উদ্দেশে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিল।

৪

কিছুক্ষণ ভক্তিভরে নিঃশব্দে থাকিবার পর বুকে একটু অম্বলের জ্বালা বাজিয়া শশাঙ্ক পুনরায় বলিল,—অম্বল হচ্ছে।…বলিয়া পানীয়ের অভাবে ঢোক গিলিল।

কার্ত্তিক দৃঢ়স্বরে বলিল,—আমি যদি হ'তাম তবে বিয়ে, পেটেণ্ট ওষুধ আর ফৌজদারী এক সঙ্গে লাগিয়ে দিতাম…

শশাঙ্ক আর একবার ঢোক গিলিতে যাইতেছিল—চম্‌কিয়া বলিল,—ফৌজদারী ? কার সঙ্গে ?

—কার সঙ্গে আবার কি ? আকাশ থেকে পড়লে যে ! কার সঙ্গে ! শ্বশুর আর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে।…দিতাম দু'জনকে আসামী করে' এক নম্বর ঠুকে'…দু'বৎসর শ্রীঘর।…বলিয়া কার্ত্তিক দুই হাত বাড়াইয়া একজোড়া কাল্পনিক লৌহ কপাট দুই বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিল।

শশাঙ্ক ক্ষীণস্বরে বলিল,—একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি—

—আর তাঁরা প্রাণপণে কান মলে' তেল নিংড়েছেন… তাদের সঙ্গে মাম্‌লা, গোলমাল ! ছিঃ !…অসহ্য, নয় ?…খেতে দিত ভাল করে' ?

অসহ্য বিদ্রূপের ভঙ্গীতে এই কথাগুলি বলিয়া কার্ত্তিক মহাভৃঙ্গ-রাজ তৈলের ভাণ্ডের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল—যেন ভাঁড়ের গায়ের সবুজ রঙের অক্ষরগুলি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

শুরালশ্বয় অবস্থিত বলিয়া বৃহৎ সহরটাকে হিংস্র ও খলতাপূর্ণ

সর্পপুরী কল্পনা করিলেও, অম্বলের জ্বালা এবং ষোল-আনা ইচ্ছার প্রভাব শশাঙ্ক কবিরাজের সর্পভীতি অপেক্ষা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল···

তদুপরি শশাঙ্কের পিতা লিখিলেন—

বাবা শশ,···একটি সুন্দরী বয়স্থা এবং রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী কন্যার সন্ধান পাইয়াছি। তোমার মত্ পাইলে সেইস্থানে বিবাহ সুস্থির করিতে পারি। তোমার শরীর অসুস্থ লিখিয়াছ। কোথাও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে নিষেধ করিয়াছ; কারণ এখন অর্থাৎ অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে অপর পক্ষের আক্রোশই জন্মিবে এবং অলঙ্কারগুলি আদায় করা আরও কঠিন হইবে লিখিয়াছ; কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ইহাই যে শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্। অতএব আমার মতে শরীর সুস্থ রাখিয়া অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিধেয়।···

আরো ছিল—

এবারকার কুটুম্ব মনের মত হইবে; কন্যার পিতাও কবিরাজ—তাঁহার ঔষধের ভাণ্ডার প্রচুর···ইত্যাদি অনেক সংবাদ পত্রে ছিল···

কিন্তু কার্ত্তিক ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়াই লাফাইতে লাগিল···

তারপর অলঙ্কার সম্পর্কে শশাঙ্কের আভ্যন্তরিক চতুরতা স্মরণ করিয়া সে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল···

বলিল,—তুমি ডুবে' ডুবে' জল খাও।

শশাঙ্ক বলিল,—যাঃ।

—যাঁদের মা বলেছ, বাবা বলেছ, তাঁদের ক্ষুণ্ণ না-ই করলে।

৬

শশাঙ্ক আলস্যের সহিত বলিল,—সে পরের কথা।

বিবাহ হইয়া গেল—

—এবং বিবাহের পরই শশাঙ্কের আর সবুর সহিল না—স্ত্রীকে আনিয়া সে খাঁচায় পুরিল।

শশাঙ্ক কবিরাজের এই ছ'টাকা ভাড়ার প্রবাস-গৃহ বড়ই সঙ্কীর্ণ। ছ'ফুট লম্বা আর সাড়ে চার ফুট চওড়া রাস্তার ধারের ঘরটিতে সে ঔষধালয় করিয়াছে; কাচের আলমারী দু'টি, চেয়ার একখানি, বেঞ্চি একখানি লইয়া তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ। এই ঘরের সম্মুখে দরজা নাই—শিক্-গাঁথা ফটক আছে। ঔষধালয়ের পরের কক্ষটি শয়ন কক্ষ; কিন্তু ঔষধালয় হইতে ভিতরে মানুষ আর বায়ুর অবাধ যাতায়াতের পথের মুখে আলমারী চাপা দিতে হইয়াছে। শয়নকক্ষের আয়তন পূর্ব্ববৎ। তারপর উঠান্—ঐ ছ'ফুট আর সাড়ে চার ফুট। রান্নাঘর আরো ছোট। উঠানের পর যে প্রাচীর উঠান' হইয়াছে তাহা টপ্‌কাইতে পারে এমন ডানপিটে দুর্লভ।

যাহা হউক, ইহা নিজের বাসা—পূর্ব্ব-পক্ষের পিতৃ-গৃহ নহে। ইহারই ভিতর স্ত্রীকে আনিয়া শশাঙ্ক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল··· কিন্তু সে টের পায় না যে, স্থানস্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত তার স্ত্রী ইন্দিরার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

বন্ধুরা আসে যায়; ক্ষুধাবৃদ্ধির ঔষধ সেবন করে; আর

শশাঙ্কের "রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী" স্ত্রীর হাতের রান্না খাইবার জন্য অশেষ লোলুপতা প্রকাশ করে...

শশাঙ্কের অপর কোনো আপত্তি নাই, কেবল একটি আপত্তি; বলে,—ওঁদের চোখের সাম্‌নে উৎসব করা কি ঠিক্ হবে এখন!... একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি...

বলিয়া ও-পাড়ার এক কন্যাশোকাভিভূত বৃদ্ধ দম্পতির ছবি মনে পড়িয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

কার্ত্তিক বলে,—তুমি ন্যাকা আর ধূর্ত্ত।

শশাঙ্ক নির্লিপ্তভাবে বলে,—সে কথা হচ্ছে না।

সতীশ বলে,—তুমি উৎসব গোপনে করো'...ঢাক-ঢোল না-ই বা বাজল' তাঁদের চোখের সাম্‌নে।

শশাঙ্ক বলে,—না, আমি তা' বলি নাই।

নবকুমার বলে,—তাঁরা ত' কন্যার শোকে উৎসব বন্ধ রাখেন নাই। সেদিনও নবান্ন করলেন—ঘটাটা দেখলাম।

কার্ত্তিক নিন্দা করিতে পাইলে ছাড়ে না; বলিল—বাড়ীতে শুনলাম, থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেদিন কি ঝগড়া! কে নাকি বলেছিল, মেয়েটা ম'লো, কিন্তু চিকিৎসা হল না। তোমার শাশুড়ী ঠাকৃরুণ তাতে বললেন, সে মেয়ে সতী ছিল; সতীর দেমাক্ নিয়ে সে মরেছে।...তোদের মত?...যাক্—তারপর গোলমালে থিয়েটার ভেঙে যায় দেখে শেষে পুলিশ এসে থামায়।...যত চক্ষুলজ্জা তোমার! বলিয়া যথোচিত অবজ্ঞাভরে কার্ত্তিক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

শুনিয়া শশাঙ্ক কবিরাজের ধর্ম্মে মতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়; বলে,—ভাই, আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।

কার্ত্তিক বলে,—হুঁ।

কার্ত্তিক শুনাইতে চাহিলেও শশাঙ্ক সে-কথা কানে তোলে না; বলে,—সে উদার ছিল কত!...একদিন বল্‌লাম, তোমার হাত খরচের টাকা থেকে একটা টাকা দাও দিকি।...টাকা কেন চাইলাম তা' পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে না—অম্লানবদনে এনে দিলে। ...আমি হেসে টাকা ফেরৎ দিলাম, বল্‌লাম, তোমার মন বুঝলাম। টাকা তুমি রাখো।...শুনে' সে-ও হাস্‌তে লাগল।

সতীশ না হাসিয়া বলিল,—হাসির কথাই বটে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—ইনি কেমন, উদার না অনুদার?

—ইনিও উদার; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। ...ইনি বলেন, একদিন যাঁদের মা বলেছ বাবা বলেছ, যাঁদের কন্যাকে ভালবেসেছ, তাঁদের সঙ্গে সামান্য কয়েক ভরি সোনার দাবি নিয়ে ঝগড়া করো না অশিক্ষিত লোকের মত।...আমার অদৃষ্টে যদি সোনা পরা থাকে তবে অমনিই পরব—আপনিই হবে। অদৃষ্টে যদি না থাকে তবে ও সোনা পেলেও আমায় গায়ে থাকবে না।...বলিয়া এতবড় শক্তিশালী অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে-শক্তি হস্তগত স্বর্ণের অঙ্গে থাকা নিবারণ করিতে পারে তাহার উদ্দেশে শশাঙ্ক কপালে হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

—সে যাক্। সত্যিই খাওয়াবে কবে?—রান্নার খ্যাতি আরো ছড়ালে' আরো উমেদার বাড়বে।...বলিয়া নবকুমার শশাঙ্ক ব্যতীত আর দুজনের এবং নিজের গা ছুঁইয়া এক দুই করিয়া গণিয়া দেখিল, সম্প্রতি তাহারা মাত্র তিনজন উমেদার।

এমনি কথা হইতে হইতে শশাঙ্ক যেন হঠাৎ ভগবানের বিশেষ

কৃপা লাভ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল—এত শীঘ্রই যে খাওয়াইতে পারিবে সে কল্পনা সে করে নাই···

ভগবানের উদ্দেশে হাত তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, পরশু।

কার্ত্তিক বলিল,—আজ কি বার?

—শুক্রবার।

—কাল?

—শনিবার।

—পরশু?

—রবিবার।

—তা' হলে রবিবারে?

পরশু অর্থাৎ রবিবার যথাসময়ে আসিয়া পড়িল।

নিরামিষ রন্ধনেই শশাঙ্কের স্ত্রী বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া মিহি চালের ভাত আর অল্প-স্বল্প মৎস্য এবং নিরামিষ তরকারীর বেশী বেশী আয়োজন হইয়াছে।

বাঃ, দিব্যি, অতি সুন্দর, উপাদেয়, চমৎকার, ইত্যাদি তুষ্টি এবং বিস্ময়সূচক ধ্বনির মধ্যে ভোজন সমাপ্ত হইল···আঁচাইতে বসিয়াও সেই ধ্বনিই চলিতে লাগিল···আঁচাইবার পর বসিবার ঘরে অর্থাৎ ঔষধালয়ে ফিরিবার পথেও সেই ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি চলিতে চলিতে, সকলের পশ্চাতে ছিল সতীশ, সে হঠাৎ মুখ

১০

ফিরাইয়া দেখিল, শশাঙ্কের স্ত্রী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে—

মুখ অনাবৃত।

কেহ মুখ ফিরাইয়া চাহিবে ইহা ইন্দিরা ভাবিতে পারে নাই, চোখোচোখি হইতেই সে চক্ষু নত করিল···

চোখ নামাইবার ভঙ্গীটি চমৎকার—তাহাতে নিষেধের অন্ধকার নামিয়া আসিল না···যেন প্রস্ফুটিত শতদল একটি নিমেষের জন্য দলগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিল মাত্র—

পূর্ব্বগামীর পায়ের সঙ্গে নিজের পায়ের ঠোক্কর লাগিবার ভয়ে সতীশ পরক্ষণেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিল···

আরাম করিতে আসনে বসিয়া নবকুমার বলিল,—খেলাম বটে, গুরু-ভোজনই হল; কিন্তু এখন যেন কেমন একটা অরুচি লাগছে। তোমাদের রুচি কেমন তা' জানিনে।

শুনিয়া শশাঙ্ক মরমে মরিয়া গেল; বলিল,—কি ত্রুটি হয়েছে, ভাই? অপরিষ্কার কিছু ছিল কি?

—তুমিই একটা মস্ত অপরিষ্কার! এখন দেখছি, হোটেলে খেয়ে এলাম। হোটেলের রসুয়ে ঠাকুর রাঁধে ভাল—ব্যস, এই পর্য্যন্ত!···অর্থাৎ কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি ঢ্যাঙা মিনসে কেন পরিবেষন করলে?

এই কথায় শশাঙ্ক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল···বলিল, —তা' আমি বলি নাই ভেবেছ? নিশ্চয় বলেছি। কিন্তু সে বল্লে, আমি দিশে পাব না, হাত কাঁপবে।

—আচ্ছা, আর একদিন। বলিয়া আহারের গুরুত্ববশতঃ নবকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল…

—আমি খেয়ে আসি। তোমরা ততক্ষণ—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্রাম করি। তুমি খেলে' পর ওঁরা খাবেন। ঢের বেলা হয়ে গেছে—যাও।…বলিয়া কার্ত্তিকও চক্ষু মুদ্রিত করিল।

নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় শুইয়া বসিয়া ওরা কি ভাবিতে লাগিল তাহা ওরাই জানে; কিন্তু সতীশের মুদিত চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরা—ঠিকই যে শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রীরূপে তাহা নহে, একটী নারীরূপে…

তার মনে হইতে লাগিল, এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যারচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে…এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে…

এ পথ দেয়, কিন্তু যে জ্যোতিঃপরিমণ্ডলের সৃষ্টি এ করিয়াছে তাহার বাহিরে যাইবার সাধ্য মানুষের নাই…যদি কেহ যায় সে ক্ষিপ্তের মত ফিরিয়া আসে…ইহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ নিজের সত্তা সহ্য করিতে পারে না…ইহার বাহিরে মানুষের প্রসার বন্ধ, দৃষ্টি অন্ধ, নিঃশ্বাস অচল, স্নায়ু নিষ্ক্রিয়, কল্পনা মূক, আনন্দ মূর্চ্ছিত…

এই অক্ষয়যৌবনা মানুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে আকর্ষণ

করিয়া আনে···ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ স্বর্গকে কল্পনা করিতে পারে নাই···ইহাকে অন্তরালে রাখিয়া কবির কাব্যরচনা সার্থক হইতে পারে না···

বিরহী যক্ষের প্রিয়া এ, কবির কাব্যলক্ষ্মী মানসী এ ; পুরুষের বেদনা ইহারই উদ্দেশে চিরদিন নিবেদিত হইতেছে···মিলনে বিরহে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগতপ্রাণ নিয়ত নৃত্য করিতেছে···

এ কেবল বলিতেছে, আমায় আবিষ্কার করো···

শ্রীর এ সহগামিনী—ভাব-বৈকুণ্ঠে ইহার গতি···

রস-বৈভবশালী যে তাহারই এ পরিচারিকা···

ভাবিতে ভাবিতে ভাতের নেশায় সতীশ কখন্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—শশাঙ্কর ডাকে চম্‌কিয়া জাগিয়া দেখিল, আরো পান আসিয়াছে—দুটি পান গালে ফেলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তিনমাস অতীত হইয়াছে।

সতীশের কাব্যামোদ হুহু শব্দে চলিতেছে—

সে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে স্থূল গদ্যে তাহার মর্মার্থ এই যে, অয়ি অনাবিষ্কৃতা এবং বহুবন্দিতা, তুমি একদিকে চিন্ময়ী অপরদিকে তীব্র চেতনাময়ী···তুমি নিত্যাভিসারিকা, তুমি বহু উপভোগ্যা, কিন্তু অনুচ্ছিষ্টা···অতএব তুমি এস···বৃদ্ধ বাল্মীকি তোমাকে যে-রূপে পাইয়াছিল, তোমার যে-রূপের তরঙ্গ চির-উত্তাল, সেই-রূপে তুমি আমার যৌবনের দুয়ারে অতিথি হইয়া এস।···

এদিকে কার্ত্তিকের মারফত্ কয়েকটি কাবুলী রোগী হাতে আসায় শশাঙ্ক কবিরাজের লক্ষ্মীশ্রী এবং সাইনবোর্ড উভয়ই উজ্জ্বলতর হইয়াছে; শিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া সে এখন ঔষধালয়ে "বাহির হয়", এবং হামালদিস্তায় গাছের ছাল কুটিবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছে।

হামিদ খাঁ কাবুলী পূর্ব্বে বলিত, ডাক্তারেরা চোর; কিন্তু তাহার খুক্ খুক্ কাশি, পাঁজরে ব্যথা এবং তৎসহ স্বরভঙ্গ সাত দিনে বার-আনা ভাল হইয়া যাওয়ায় সে-বুলি সে ত্যাগ করিয়া আরো কয়েকটিকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়াছে। তবে চিকিৎসা সুরু করিবার পূর্ব্বে কার্ত্তিক আর কবিরাজ উভয়ে মিলিয়া হামিদ খাঁর সাইকেল আর লাঠি কাড়িয়া রাখিয়াছিল…হ্যাণ্ডনোটের ছাপান' খাতাখানাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। আর, চিকিৎসাকালে কার্ত্তিক ঔষধ গাড়িয়া তাহাকে সেবন করাইয়া আসিত।

ওরা দেয় ভাল—এক রকম ঢালিয়াই দেয়; তবু টাকায় তু'-আনা সুদের অধিকাংশ কবিরাজ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া খাঁর রাগ হয়—যা' তা' বলে—

শশাঙ্ক মনে মনে বলে, জানোয়ার, দেশটাকে ফাঁপা করে দিলে' …মুখে বলে,—তোমার স্বরভঙ্গ মেদজ হ'লে আর বাঁচতে না; পিত্তজ বলেই রক্ষে।…চেঁচিও না বেশী, বুঝলে? বলিয়া শশাঙ্ক হাসে; যেন তাহার হাসি দেখিয়া হামিদের রাগ পড়িবার কথা।

হামিদ বলে,—চেঁচাবে না তবে সুদ শালা বাঙালীকে ছেড়ে দেবে?

১৪

যাহা হউক, সেদিন হামিদ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ খাঁকে বিদায় করিয়া শশাঙ্ক কবিরাজ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু হিসাবে ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি আকর্ষণকল্পে ধূপদানীতে টিকার আগুন করিল; চৌকাঠে আর ক্যাস্‌বাক্সের উপর কূপোদকের ছিটা দিল; ক্যাস্‌বাক্সের ডালা তুলিয়া ভিতরে ধূপগন্ধী ধোঁয়া দিল…তারপর প্রজ্জলিত লণ্ঠন এবং বিবর্ণ ক্যাস্‌বাক্সের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া উপবীত ধারণকরতঃ ধ্যান-ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক যখন সে মুখে বলিতেছে ওঁ, ঠিক তখনই সতীশ, নবকুমার আর কার্ত্তিক আসিয়া উঠিল—

ক্যাস্‌বাক্সের উপর কপালের স্পর্শ রাখিয়া দিয়া স্তিমিতনেত্রে শশাঙ্ক বলিল,—বস'।

—বসি। বলিয়া কার্ত্তিক বসিল…তারপর শাসাইল,—মহাদেবের অভিসম্পাৎ লাগবে, কব্‌রেজ।

আয়ুর্ব্বেদের প্রথমতম সৃষ্টিকর্ত্তা শিবের নামটি তখন শশাঙ্কের অম্বলের জ্বালাযুক্ত বুকের ভিতর বাজিতেছিল—পবিত্র সন্ধ্যা-বেলায় দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রকাশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল,—শিবরোং…

তারপর বলিল,—না, না…

কার্ত্তিক বলিল,—অত নিরীহ তুমি নও হে কব্‌রেজ; দেবাদিদেবের মোদকে তুমি ফাঁকি চালাচ্ছ।…কই, তেমন ফল হচ্ছে কই?

সতীশ বলিল,—মাত্রা ডবল্ করো।

কার্ত্তিক হাসিল—

এবং বলা বাহুল্য যে, হাস্যপূর্ব্বক মাত্রা ডবল করা ছাড়া কবিরাজের উপায় ছিল না।

গুলি উদরস্থ করিয়া নবকুমার বলিল,—বৌদি নাকি মাংস রাঁধতে শিখেছেন ভাল?…শশাঙ্ককে প্রশ্ন করিয়া সে কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশাঙ্ক উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল,—আমি ত' বৃথা-মাংস খাইনে…বাপের বাড়ীতেও মাংসের সেরূপ চল্ নেই।

—তা না থাক্; এখানে এসে যদি শিখে যান্ তবে ভাইয়েরা যশ করবে…বিদ্যেটা ত কম নয়!

—সময় বড় কম। তা ছাড়া—

—কেবল মুখো সিদ্ধ করাচ্ছ বুঝি? কত জীবন যে এমনি করে নষ্ট হচ্ছে কে তার হিসাব রাখে! বলিয়া নবকুমার একটা দুঃস্থ নিঃশ্বাস চাপিয়া গেল।

শশাঙ্ক বলিল,—তা কিছু কিছু করতে হচ্ছে; তাতে আলস্য নাই।…বাপ কব্রেজ, আমিও তাই; নূতন কিছু নয়।

—তবে এখন থাক…কিছুদিন সময় দিলাম; ইতিমধ্যে শিখিয়ে নাও…অন্নপ্রাশনেই খাওয়া যাবে।

শশাঙ্ক কল্‌কল্ করিয়া বলিয়া উঠিল,—আরে, ভাই, তাই বুঝি ঘটে…বমি করছে হৌ হৌ করে…

কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিল,—এরই মধ্যে?…তারপর কোলাহল চলিতে লাগিল…কিন্তু সতীশের আবহমানকালের মানসীর সঙ্গে যে নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল তাহা খাঁড়ার ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত

হইয়া গেল...বিন্ধ্যগিরি যেমন সূর্য্যের পথরোধ করিয়া শিরোত্তলন করিয়াছিল, তেমনই দুর্লঙ্ঘ্য একটি প্রাচীর তাহার ভাবস্রোতের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল...

অন্ধকার একটি মার্গ দিয়া সে যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের মত অন্তরীক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিল...

তাহার মনে হইল, এ সে নয়।

জ্ঞানাঙ্কুর

মহেশ্বর মিত্র যে যৌবনে অত্যন্ত সৌখীন পুরুষ ছিলেন তাহার নিদর্শন এখন তাঁর আপাদমস্তকে কোথাও নাই—তখনকার সেই ঘোর-বাবুটিকে এখন দেখিলে চেনা যায় না; কিন্তু তাঁর সৌখীনতার অনেক কাহিনী এখনও জনরবের বাহনে চলা-ফেরা করিতেছে—আর, তার সবগুলিই নির্ম্মল নহে। এখন মহেশ্বরের দেহ স্থূল হইয়া কোমর মোটা বেঢপ্ দেখায়—পশ্চিমা ভৃত্য রামকেতন মেদরাশি মর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে আরাম দেয়। মহেশ্বরের চোখে ছায়া নামিয়াছে—সে দীপ্তি নাই; তাঁহার চক্ষু এখন যাহা দেখে তাহা যেন পুরাতনেরই নামান্তর বা পুনরাবৃত্তি—চোখ আছে বলিয়াই চাহিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই, কিন্তু সে দেখায় রস নাই, লিপ্ততা আসে না। কিন্তু যৌবনে তিনি এমন নিঃস্পৃহ ছিলেন না—তখন তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, চারিদিকে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিতেন, সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার সুযোগ খুঁজিতেন, আয়ত্তাতীত বুঝিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন।

লোকে বলে নানাকথা—

কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের আর রসলিপ্সার বিশ্বাসযোগ্য একমাত্র তর্কাতীত প্রমাণ তাঁহার এবং তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্টা স্ত্রীর অর্থাৎ তদানীন্তন নবদম্পতির ঐ চিত্রখানা—সস্ত্রীক ফটো

তুলাইয়া বিলাতী শিল্পীর দ্বারা তাহা বৃহদাকার করাইয়া আনিয়াছেন—চতুর শিল্পী যুবক-যুবতীর অন্তরের ভাষাতীত ভাষা চোখে-মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মহেশ্বর মিত্রের স্ত্রী অসিতার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়—মহেশ্বর সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ…ঐ অতুল রূপপুঞ্জ তাঁর সম্ভোগ্য, তাঁর অধিকার অবিসম্বাদিত—রূপৈশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে তিনি যত গর্ব্বিত তত আনন্দিত।…তাঁর বসিবার ভঙ্গীতে, চাহনির ভঙ্গীতে, অধরের ভঙ্গীতে একটা ধূর্ত্ত অথচ নিশ্চিন্ত লালসালিপ্ততা ফুটিয়া আছে—অর্থাৎ ঐ ছবিখানি দেখিলেই মহেশ্বরের মনেরও একটা ছবি চোখে না পড়িয়া পারে না; অক্লেশেই বুঝা যায়, মহেশ্বর মিত্র যৌবনে সৌন্দর্য্যের নিষ্ঠাবান উপাসক ছিলেন, রসিক ছিলেন—অদ্বিতীয় সুন্দরী রমণীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

ছবিখানি তাঁর তখনকার শয়নকক্ষের দেয়ালে টাঙানো হইয়াছিল—সেখানেই আছে। এমনি কৌশলে তাহাকে স্থাপিত করা হইয়াছে যে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাহিরের রৌদ্রের প্রতিফলিত আভা সেই ছবির উপর পড়িয়া আলোকাতীত একটা সূক্ষ্ম শ্রীমণ্ডিত হইয়া ছবির শোভা যেন কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে …প্রেমাবেশে ঢল-ঢল চারিটি চক্ষু এমন সত্য হইয়া ওঠে যে, শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

কিন্তু বহুবার দেখিয়া দেখিয়া সে ছবি বাড়ীর লোকের কাছে পুরাতন হইয়া গেছে। ছবি যাহাই বলুক, ছবি যাঁহাদের তাঁহারা এখন অন্য মানুষ। মনে হইতে পারে, মহেশ্বর এখনও বুঝি

তৎকালীন মানসাভিসারসুখ ঐ অমর অভিজ্ঞান চিত্রের মারফৎ উপভোগ করিতে চান—তাঁর যৌবনের সহচরী এখনো বুঝি বন্ধন-উল্লাসে তেমনি বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন! কিন্তু তাহা সত্য নহে। মহেশ্বর মিত্র বিস্তর ভূসম্পত্তির আর কাঞ্চনের মালিক হইয়াও যথাসময়েই বিলাস-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে রক্তকে উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজনার অনুপাতে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা তিনি জানেন। তিনি এখন অরণ্যবাসী, অর্থাৎ বৈঠকখানায় শয়ন করেন, মালা ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরচিন্তা করেন, ইত্যাদি।

মহেশ্বর মিত্রের তিনটি পুত্র, চারিটি কন্যা। প্রথম সন্তান পুত্র, নাম সুখেন্দ্র—সুশিক্ষিত এবং বিবাহিত এবং কয়েকটি সন্তানের জনক; দ্বিতীয় সন্তান কন্যা, মালতী, বিবাহিতা এবং কয়েকটি সন্তানের জননী; তারপর কন্যা, বকুল—বিবাহিতা; তারপর পুত্র দীনেন্দ্র, অবিবাহিত; তারপর কন্যা গোলাপ, বিবাহিতা; তারপর পুত্র ধনেন্দ্র, অবিবাহিত এবং কলেজের ছাত্র; তারপর সপ্তম এবং শেষ সন্তান কন্যা শতদল, অবিবাহিতা।

পুত্র কন্যার অল্প-বয়সেই বিবাহ দেওয়া মহেশ্বর মিত্র পছন্দ করেন না। ছেলেমানুষ বাপ-মায়ের ছেলেমেয়ের হাড় মোটা হয় না বলিয়া তাঁর ধারণা।

মহেশ্বর সস্ত্রীক সুখী—তাঁহার সংসারে অশান্তি নাই! ছেলেরা মেধাবী, কথার বাধ্য; জামাই তিনটি কৃতবিদ্য, অর্থবান; মেয়েরা

সুন্দরী ; বিবাহিত তিনটি সুখে স্বামীর ঘর করিতেছে—পিতৃ-গৃহে আসিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করে না, কিন্তু হামেসাই খোঁজ-খবর লয়।…অনুরাগে, স্বাচ্ছন্দ্যে, নির্ব্বিরোধে, উন্নতি-পরম্পরায় সুসজ্জিত হইয়া, তৈল-মসৃণ চক্রের মত নিঃশব্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে—

এমন সময়, পদ্মার সুবিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যস্থলে যেমন রুক্ষদেহ বালুচর পিঠ তোলে, তেমনি, বৃহৎ এবং অবাধগতি মহেশ্বরের সংসারে একটি বিরুদ্ধ শক্তি হঠাৎ মাথা তুলিল…

মহেশ্বরের কানে পৌঁছিল, মধ্যম পুত্র দীনেন্দ্র নাকি অন্তঃপুরে প্রকাশ করিয়াছে যে, বিবাহে তার রুচি নাই। তাঁহার সংসারের নিয়ম প্রতিপালনে পুত্রের এই অনিচ্ছা অর্থাৎ পুত্রের দুঃসাহস দেখিয়া মহেশ্বর মিত্র একটু হাসিলেন মাত্র—বিচলিত হইলেন না। পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে নিজের ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে তিনি সক্ষম। ছেলেগুলিকে তিনি নিজের হাতের কাদার পুতুল মনে করেন—তাদের ভাঙা-গড়া রূপ দে'য়ার কাজে তাঁর নিজের অঙ্গুলি চালনাই চরম শক্তি।…আর একটা কথা এই যে, এই ছেলেটিকেই তিনি মনে মনে বেশী পছন্দ করেন—মনে মনে করিলেও অন্যান্য মন তাহা টের পাইয়াছে। এই ছেলেটির চেহারা ঠিক বাপের মত বলিয়াই ঐরূপ মানসিক পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের বিশ্বাস। দর্পণে নিজের মুখের ছায়া সকলেরই ভাল লাগে ইহা সত্য ; সুতরাং আত্মজ সজীব প্রতিচ্ছায়াকে আরো ভাল লাগিবে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া পুত্রকে যথেচ্ছাচারী হইবার স্বাধীনতা দিবার লোক মহেশ্বর মিত্র নন ;

মনের কোনো অংশে দুর্ব্বলতা থাকিলে তিনি ধনে-মানে সবাইকে ডিঙ্গাইয়া এমন অটল অভ্রভেদী হইয়া উঠিতে পারিতেন না।

গ্রাজুয়েট বুড়ো বুড়ো ছেলেদের এখনও এমন সাহস জন্মে নাই যে, জোরে জোরে পা ফেলিয়া জুতার শব্দ করিয়া বাপের সুমুখ দিয়া যায়—জুতা সমেৎ পা টিপিয়া টিপিয়া তারা যেন ভয়ে ভয়ে কাটাইয়া ওঠে।

দীনেন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ।

মেয়েরা সবাই সুন্দরী; কিন্তু সকলের সেরা সুন্দরী ছোট মেয়ে শতদল—শেষ ফুলটির উপরেই যেন বিধাতার সকল স্নেহ ঢালিয়া পড়িয়াছিল। অন্তঃপুরে যাহাদের যাতায়াত আছে, শতদলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহারা কতবার যে অবাক্ হইয়া গেছে তাহার ইয়ত্তা নাই; শতদলের রূপ দেখিয়া ফুরাইবার নয়, তুলনা দিয়া বুঝাইবার নয়—

তাহার তুলনা তার মা; তার মা যৌবনে যেমন সুন্দরী ছিলেন, শতদল ঠিক তেমনি সুন্দরী—এবং তাহার রূপের ইহাই শেষ কথা।

শতদলের বয়স পনর—

নারীরও মনে হয়, কালপ্রবাহের মুহূর্ত্তগুলিকে যেন অসহ্য বিস্ময়ে পুলকে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়া শতদলের বয়োবৃদ্ধি এক দুই করিয়া গণিয়া গণিয়া পায়ে পায়ে এই পঞ্চদশে পৌঁছিয়াছে…

প্রতিবেশিনী শৈলসুতা হাসিয়া বলেন: "শতদলকে দেখলে

আমার মনে হয়, স্বর্গদর্শনে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য আমার লাভ হল।"

শতদলের বিবাহের কথা চলিতেছে।

রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যবান একটি ব্যক্তি নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত শতদলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পুত্রসহ এবং অনুগ্রহপ্রার্থীর মৃদুতা লইয়া মহেশ্বর মিত্রের দরবারে আসিয়াছিলেন; কিন্তু মহেশ্বর মিত্র তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কেবল এই কারণে যে, ছেলেটি, তাঁহার মতে, দেখিতে তত সুশ্রী নয়।

শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনকুলীনের ঘরে শতদলের এখনই বিবাহ হইয়া যায়, যদি মহেশ্বর ইচ্ছা করেন—বিনা পণেই হইতে পারে; কিন্তু ভাবী জামাতা অদ্বিতীয় রূপবান না হইলে কন্যার বিবাহ দিবেন না, এই তাঁর পণ।

কিন্তু সে-কথা যাক।

বিবাহ করিবে না, এই ইচ্ছা দীনেন্দ্র গোপনে পোষণ করিত কিন্তু তাহা আর গোপন নাই; এবং গোপনে সে আরো কিছু করিত, তাহাও আর গোপন রহিল না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার পুস্তকগুলি পড়া শেষ করিয়াছে—সে অনেক; তবু তার বই পড়িবার আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই। সে পড়ে, নাটক নয়, নভেল নয়—চিত্তরঞ্জনী লঘু সাহিত্য লইয়া কলাবিলাসিতা সে করে না; সে পড়ে ইতিহাস, ব্যক্তির আত্মার প্রস্ফুটনের, প্রাণের জাগরণের, লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যগ্রতার, চিন্তার পুরিপুষ্টির, ব্রহ্মচর্য্য পালনের, জনসেবকগণের অনাহত আত্মদানের…দেশ-

বিদেশের সাধুগণের জীবন-কথা লইয়া সে চিন্তা করে, আর প্রলুব্ধ হয়।

দীনেন্দ্র তাহার নিভৃত কক্ষ হইতে একদিন প্রচার করিল যে, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মুশুরির ডাল, পান এবং আরো কয়েকটি অনুপকারী বস্তু সে অদ্য হইতে চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিল—সে আতপান্নে কয়েক বিন্দু গব্যঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহাই আহার করিবে—তাহাও দু'বেলা নয়, একবেলা; এবং ভাতে লবণ না লইয়া যদি চলে তবে লবণও লইবে না।

এই বৈরাগ্যের নিদারুণ বার্ত্তা অতর্কিতে শুনিয়া তাহার মা অসিতাবরণী চমকিয়া উঠিলেন; দাদা সুখেন্দ্র অবজ্ঞার হাসি হাসিল; ভগিনীরা চিন্তিত হইল…ইহা যৌবনের ধর্ম্ম এবং তার অহৈতুকী ভাবাতিরিক্ততা মনে করিয়া পিতা মহেশ্বর মিত্র বৈঠকখানায় বিরক্তি বোধ করিলেন…

তা করুন—

এদিকে দীনেন্দ্র ত্যাগের দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া গেল; সুকোমল শয্যা অর্থাৎ গদি তোষক পাশ-বালিশ নামাইয়া দিয়া দুইখানি কম্বল তুলিয়া লইল—একখানি সাদা, একখানি কালো।

এই সব কৃচ্ছ্রসাধনা দেখিয়া একটা সন্দেহ জাগিল যে, পিতার মুখাবয়বের মত যদি পুত্রের মুখাবয়ব হয় সেই পুত্র সুখী হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা কি সত্য ?…সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়, তাহাই বুঝি কাজে-কর্ম্মে এই গৃহেই ঘটে!

দীনেন্দ্রের ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান এখন প্রায়ই কুঞ্চিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়।

২৪

বৈঠকখানায় বসিয়া দূতের মুখে মহেশ্বর মিত্র সব শুনিতেছেন, কিন্তু টলিতেছেন না—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস একটি ধমকেই সব 'বেয়াড়াপনা' সিধা হইয়া যাইবে। পুত্রের বৈরাগ্য এখনো এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে, বাক্যব্যয় করিতে হইবে। স্ত্রীকেও তিনি তাহাই বুঝাইয়া বলিয়া বৃথা অশ্রুমোচন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। দেখা যাক, ছেলের খেয়ালের দৌড়ই কতদূর।

দীনেন্দ্রের বিবেচনায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র ইঁহারা কেহই নন—পরমহংসদেব। নারীর সঙ্গে যাঁর যতটা সংস্রব ঘটিয়াছে তাঁর আদর্শের উচ্চতা ঠিক সেই পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গেছে; দৈবী পার্থক্য ঘুচিয়া তিনি তখন সাধারণের পংক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—পরে উৎকৃষ্ট কথা যতই বলুন, আর উৎকৃষ্ট আচরণ যতই করুন। পরমহংসদেবই একমাত্র উপাস্য—অনুবর্ত্তনের যোগ্য, অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য আর সহজ ঐশী সূক্ষ্ম জ্ঞানের জন্য। তাঁহাকে অশক্ত বলিবার উপায় নাই; বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেবের মত তিনি নবধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে প্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চিৎশক্তির কণামাত্র লাভে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিয়াছিলেন তাহা অলৌকিক; স্বামীজির শক্তি এখনো জাগ্রত—ভগীরথের শঙ্খধ্বনির মত তাঁর কণ্ঠ এখনো দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইতেছে; পতিতপাবনী সুরধুনীর মত এখনো সে কর্ম্মের ধারা

হিন্দুস্থানে প্রবাহিত !···আরো আনন্দের কথা এই যে, স্বামীজি কোনো অনির্দ্দিষ্ট বা অজ্ঞাত থিয়োরীকে খাড়া করিতে ছুটাছুটি করেন নাই—শাশ্বত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মজ্ঞান মানুষের অন্তরে সঞ্জীবিত আর সঙ্ঘের সংহতি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেছেন। এমন যে শিষ্য, তাঁহাকে প্রণাম। তাঁর কর্ম্মসাধনা ছিল আধ্যাত্মিকতারই স্বচ্ছ অভিব্যক্তি —মানুষকে মানবতার দিকে উন্মুখ করিয়া বিপ্লবসৃষ্টির জন্য যে সাধনসামর্থ্য আর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগরীতির প্রয়োজন তাহা তিনিই আবিষ্কার করিয়া দেশকে বাক্‌সর্ব্বস্বতার ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছেন। শিষ্য যে শক্তির আধার হইতে এই অপরিমেয় যোগবল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিধরকে প্রণাম।···এত শক্তির মূলে ছিল অম্লান ব্রহ্মচর্য্য।

দীনেন্দ্র মনে মনে পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষাই হইল তার প্রধান লক্ষ্য—সকল সাধনার প্রথম সূত্র; উহাতে চিন্তা করিয়া একটা পদ্ধতি নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই।···আর্ত্ত-আতুরের সেবার ব্রত কোন্ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রহণ করা যাইবে তাহা ক্রমশঃ বিবেচ্য। ২১শে ফাল্গুনের দেরী আছে। ২১শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—ঐ দিনেই চূড়ান্ত হইবে।

যে অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় নাই, অথচ চক্ষুলজ্জার কাতরতা আছে, উত্তমর্ণের সঙ্গে দৈবাৎ চোখাচোখি

হইয়া গেলে সে যেমন ভাঙিয়া পড়ে, পথে স্ত্রীলোক দেখিলে দীনেন্দ্রের বিপদ হয় তদ্রূপ—তার বুক ধড়ফড় করে, মাথা হেঁট হইয়া যায়।

এ ত হইলই; আরো হইল ইহাই যে, বাড়ীতে যে গানের কল আছে তাহার অনেক গানই দীনেন্দ্রের অশ্রাব্য হইয়া উঠিল··· থাক্ তাহাতে কলাশ্রী আর কণ্ঠলালিত্য, হউক তাহা সহজিয়া ধর্ম্মের নামে, কিন্তু দৈহিক লালসার উৎকটতা তাহাতে আছে। নারীকণ্ঠের প্রেমকাকুতি কলের মারফৎ কানে পৌঁছিলেও একেবারে নির্ব্বিষ নির্জ্জীব ত সে নয়! প্রাণের কোটরে মৌচাক জমিয়া উঠিতে কতক্ষণ!

শতদল গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—মেজদা, সত্যিই সন্ন্যাসী হবে নাকি?

দীনেন্দ্র বলে,—সাধ্য কি? তোমরা ঘিরে রয়েছ যে!

—আমরা সবাই সরে গেলে ত তোমার ঘরই হবে মঠ! তোমাকে সে সুযোগ দেবার উপায় থাকলে আর আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে আস্‌ব কেন?

—আমার সময় নেই এখন। পড়ছি।

—তা ত দেখছিই। পড়ে' শেখা যায়, কিন্তু কষ্টসহ হওয়া যায় না—ওটা অভ্যাসের দরকার।

দীনেন্দ্র একটু নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—তা জানি।

শতদল পুনরায় বলিল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস, তুমি পেরে উঠ্‌বে না—সে বেজায় কষ্ট। দেখেছি ত! শীতে বাদলে বেচারাদের কষ্টের অবধি থাকে না। সে'বার ত এখানেই এক সন্ন্যাসী

ফুস্‌ফুসে শ্লেষ্মা জমে মরেই গেল!···এখন বই পড়ে তোমার মন খারাপ হয়েছে মাত্র।···সে যা-ই হোক্, আমি একটা খবর নিয়ে এসেছি—দুঃসংবাদটা দেবার ভার আমার ওপরেই পড়েছে। তোমার বিয়ের কনে আর দিন বাবা ঠিক করেছেন। তোমার যদি অমত থাকে তবে বাবাকে ব'লো। বলিয়া শতদল একটু হাসিল···

বইয়ের উপর হইতে হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া দীনেন্দ্র শতদলের এই হাসিটা দেখিল। পিতার কাছে দাদা কত ক্ষুদ্র, এবং দাদার এই সন্ন্যাসগ্রহণের কথাটাকে তার প্রস্তাব আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্প লক্ষ্য আয়োজন ইত্যাদি সুদৃঢ় ভাষায় যাহাই বলা হউক, আর যতই তাহাকে দুস্তর আর দুরূহ মনে হউক, তাহা যে পিতার কেবল নিঃশব্দ ভ্রূভঙ্গির সম্মুখেই কত দুর্ব্বল, এই ইঙ্গিতই ছিল শতদলের হাসিতে—দীনেন্দ্রের তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না—

দীনেন্দ্রের মুখ-চোখ এক মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল; বইয়ের দিকে চোখ নামাইয়া সে বলিল,—বাবাকে বল্‌ব।

—ব'লো; কিন্তু ফল হবে আশা করো? বলিয়া পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া শতদল দেখিল, মা আসিয়াছেন।

পুত্র ভোগবিলাসিতার বিরুদ্ধে কায়মনে তীব্র হইয়া অভিযান করিয়াছে দেখিয়া প্রাণে ছ্যাঁৎ করিয়া একটা আঁচ লাগিলেও, এবং তাহার জন্য বিলাপ করিলেও, দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবার দরকার আছে ইহা অসিতাও মনে করেন নাই। পুত্রকে স-ঘৃত আতপান্ন ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহার কান্না পায়, কিন্তু তিনি ছেলেদের চেনেন—ছেলেদের পিতাকেও

চেনেন। মহেশ্বর মিত্র ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। কেতাবী শিক্ষা তাহাদের কতদূর হজম হইয়াছে তাহা জানা নাই—কিন্তু পিতৃভীতি তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গেছে...সকল শিক্ষার উপর এই শিক্ষাই নির্ণিমেষ একটি শিখার মত জ্বলিতেছে যে, পিতার আদেশ অলঙ্ঘণীয়। বাড়ীর সকলেই তাহা জানে। পুত্র-কন্যার খেয়াল কোনোদিনই তাঁহার পক্ষে সমস্যা হইয়া ওঠে নাই। সুতরাং দীনেন্দ্রের সন্ন্যাসানুরাগ অর্থাৎ আতপান্ন আর কম্বল দেখিয়া ক্লিষ্ট বই ভীত হইবার কি আছে?...মহেশ্বর খবর দিলে অন্তরালে উহারা বিস্তর হাসাহাসি করিয়াছেন, এবং বিবাহের কন্যা আর দিন একেবারে স্থির হইয়া গেছে সেই সংবাদটা এখন দীনেন্দ্রকে দেওয়া হইতেছে।

মাকে দেখিয়াই শতদল হাসিয়া বলিল,—মা, মেজদা বল্‌ছে, যা বল্‌বার আছে বাবাকেই বল্‌বে।

অসিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিয়ের কথা বুঝি?...মেয়েটি খুব সুন্দরী রে? দেবে-থোবেও ঢের—তোর অমত আছে না কি?

দীনেন্দ্র ব্যথিত হইল—

তার মনে হইল, জননীর এই বিস্ময়-প্রশ্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর—জানিয়াও না জানার এই ভাণ তিনি করিয়াছেন, তাহাকে না হোক, তার প্রাণাধিক প্রিয় অভিলাষটিকে তুচ্ছ মনে করিয়াই ত! কিন্তু যে-ব্যক্তি সেবাব্রতী হইতে যাইতেছে তাহার মনে যেমন ঘৃণা আর কুণ্ঠা থাকিবে না, তেমনি ক্রোধও থাকিবে না।

দীনেন্দ্র বই রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কাতরকণ্ঠে বলিল,—অমত আমার আছে, মা।...তোমরা আমায়

বড় ছেলেমানুষ মনে করেছ। আমায় কিছু সময় দিলে কিছু ক্ষতি হ'ত না ত।

অসিতা বলিলেন,—তাড়াতাড়ি ত আমরা করছিনে; সময় এখনো ঢের আছে, প্রায় ছ-মাস। আর তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করতেও ওঁর বারণ আছে। তোকে জানিয়ে রাখলাম মাত্র।

দীনেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিল,—আমাকে দায়িত্ব দিয়ে রাখলে বুঝি, মা, যাতে পালাতে না পারি! কিন্তু আগে মেয়ের বিয়ের কথা না ভেবে ছেলের বিয়ের কথা কেন ভাবছ?

—জানিস্‌নে তা? ঠিক হয়ে গেছে যে! সাত দিনের আগু পিছু তোদের দু'জনের—

—কিন্তু আমি যে রাজি নই! বাবাকে ব'লো, মা।... তোমাদের ত বহু সন্তান; আর-সবাইকে সংসারী করে তোমাদের সুখ হোক্, তারাও সুখী হোক। তোমাদের একটিমাত্র ছেলে যে-পথে গেলে সুখী হয় সেই পথেই তাকে যেতে দাও না, মা! ভুলেও ভেব না আমি তোমাদের মায়া কাটিয়েছি—তোমাদের সেবার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌ব—যখনই আদেশ করবে তখনই আস্‌ব।...ঐ আসা-যাওয়ার মাঝেই আমি একটু নিজের কাজ ক'রে নিতে চাই—তাতে বাধা দিও না, মা।...তোমরাই আমাকে শক্তি দেবে—তোমাদের হয়েই আমি নিজেকে দান করব—আমি তোমাদের প্রতিনিধি আর সেবক মাত্র, আর কিছু নয়।

বলিতে বলিতে দীনেন্দ্রের দু'চক্ষু সজল হইয়া উঠিল...

এবং ঐ দু'জনার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। দীনেন্দ্র যে এমন করিয়া অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্তোলিত করিয়া আর এমন অশ্রুসিক্ত করিয়া কথার ধারা বহাইতে পারে তাহা তাঁদের জানা ছিল না—তাহাই বিস্ময়ের কথা; আরো বিস্ময়ের কথা এই যে, কথাগুলি শুনিয়াই মনে হইতেছে, এ কথার যেখানে উৎস সে-স্থান অন্ধকার নহে; ইহা খেয়াল নহে, স্বেচ্ছাচারিতা নহে, ভাণ নহে—এমন একটি সত্য বস্তু যাহা আবিষ্ট করিয়া পরাভূত করিতে চায়…কথাগুলি যেন অশ্রু-আর্দ্র ক্ষমার্থী হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা শুনিয়া, করুণায় নহে, বাধ্য হইয়াই যেন বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়—তাহার সুরে সুর মিলাইতে একটা টান ধরে।

মা আর মেয়ে বিভ্রান্ত হইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর দীনেন্দ্র পরমহংসদেবের মর্ম্মর-মূর্ত্তির আরতি শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় বৈঠকখানায় পিতৃসমীপে তার ডাক পড়িল।…বাপের আদেশ ছেলের যেমন সহিষ্ণুতার সহিত পালন করা দরকার তেমনি সহিষ্ণুতার সহিত দীনেন্দ্র তাহা পালন করিল…

স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী পুত্রকে ব্রতভঙ্গে প্ররোচিত করিতে উদ্যত পিতার সম্মুখে যাইয়া যে-ভঙ্গীতে দাঁড়াইলে সেই পুত্রের পরবশ্যতা স্বীকৃত হয় না সে-ভঙ্গীতে সে দাঁড়াইল না—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ছেলে সে নয়।

আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই দরবারে উপস্থিত আছেন দেখা গেল—যেন সালিশী মজ্‌লিস বসিয়াছে; বিচারকগণের মধ্যে মথুরানাথই প্রধান—তিনি বিশেষ চতুর বৈষয়িক এবং তৎসত্ত্বেও বিবিধ শাস্ত্রে বুৎপন্ন বলিয়া খ্যাত—আর বয়সে মহেশ্বর মিত্রেরও বড়।

দীনেন্দ্র যখন দরবারে হাজির হইল তখন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া মথুরানাথকে বলিতেছিলেন,—ভুল বলছ।...মানুষকে দাগা দেবার প্রবৃত্তি যদি ধর্ম্মের অঙ্গ হয় তবে সে-ধর্ম্ম জাহন্নামে যাক্—চাইনে আমি সে ধর্ম্ম।...আগে সে প্রমাণ করুক, সে পুত্র হিসাবে সৎ, ছাত্র হিসাবে সৎ, স্বামী হিসাবে সৎ, পিতা হিসাবে সৎ, তবেই ত তার ধর্ম্মচর্চ্চায় অধিকার জন্মাবে! তা নয়—কোনো পরীক্ষাই তার হ'ল না—সে অমনি বেরিয়ে বল্‌লে সোঽহং।... ধুৎ। বইপড়া সন্ন্যাসের মাথায় ঝাড়ু। বলিয়া মহেশ্বর মিত্র তাঁর সুবৃহৎ চক্ষু দুটি পাকাইয়া তুলিলেন।

মহেশ্বর মিত্রের ঐ কথাগুলি মথুরানাথের কথার জবাব—

মথুরানাথ বলিয়াছিলেন, যদি পুত্র বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে, এবং সংসারে থাকিয়াই কেবল ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করে এবং তৎসত্ত্বেও যদি নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কা না থাকে তবে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? সে ত ধর্ম্মের কলে বাতাসের দম লাগাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিতেছে না যে দরকারের সময় তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না! চিত্তশুদ্ধির সাধনায়, ভক্তিতত্ত্বের অনুশীলনে এবং ধর্ম্মের প্রেরণার অনুসরণে যোগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করাই উচিত—কেন না, ও আকর্ষণ দুর্ব্বার।...

তারপর, সে যদি বুঝিতে পারে ও-পথ তার নয় তবে সে আপনিই ফিরিয়া আসিবে—দড়ি লইয়া দৌড়াইতে হইবে না।

মথুরানাথের ঐ কথাতেই মহেশ্বর মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

দীনেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতেই মথুরানাথ বলিলেন,—এস, বাবা; তোমাকে, বাবা, সাধুসন্ন্যাসীর বেশে মানাবে বেশ।...কিন্তু তোমার বাবা ত তোমার বিয়ে দেবেনই!...তোমার আন্তরিক ইচ্ছেটা কি বলো দেখি, বাবা? বলিয়া তিনি স্নিগ্ধ-চক্ষে দীনেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দীনেন্দ্র সুপুরুষ সন্দেহ নাই; তার রং ফর্সা, বুক প্রশস্ত, দেহ দীর্ঘ, চক্ষু উজ্জ্বল, ললাট মসৃণ, নাসিকা উচ্চ, মুখশ্রী গম্ভীর।

দীনেন্দ্র বলিল,—আমার ইচ্ছা বিবাহ না করা।

মথুরানাথ বলিলেন,—উত্তম। তারপর?

—দীন-দুঃখী আর্ত্ত-আতুরের সেবা করা।

মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—অর্থাৎ মেথর আর মুর্দ্দফরাসগিরি।

—আঃ, তুমি থামো। বলিয়া মথুরানাথ মহেশ্বরকে ধমক দিয়া দীনেন্দ্রকে বলিলেন,—কোনো মঠে যোগ দেবার ইচ্ছে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায়?

—দীক্ষা যেখানে পাব।

—সে স্থানটা কোথায়?

—২১শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হবে বেলুড়ে... সেখানে—

—ও, সে ত কাছেই। বলিয়া মথুরানাথ আনন্দিত দৃষ্টিতে

মহেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলেন—অর্থাৎ তুমিও দেখ, বেলুড় খুব নিকটবর্ত্তী স্থান।

কিন্তু মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—আঁধারে ঢিল মেরো না, ঘুরে এসে নিজের কপালে লাগতে পারে।

মথুরানাথ তাঁহাকে পুনরায় ধমক দিলেন,—তুমি কেন কথা বলছ।...একটু দাঁড়াও, বাবা।...তারপর মহেশ্বরের দিকে না তাকাইয়াও তিনি মহেশ্বরকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমার মনে হয়, একবার ঘুরে আসুক। আপত্তি ক'রো না, ভাই, আমার বিশেষ অনুরোধ—বরং তোমরাই ওকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দাও—বেলুড় কি কাশী কি হরিদ্বার, যেখানে যেতে চায় ওকে পৌঁছে দিয়ে এস—গুরুকরণ দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি হয়ে যাক; তারপর ও ফিরে আসে ভালই—না আসে ত ওরই দ্বারা তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।...ধর্ম্মের গতি আর তার অনুষ্ঠানের পন্থা-নির্দ্দেশ বর্ত্তমান অপক্ক অবস্থায় অনাবশ্যক।

মহেশ্বর গুম্ হইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

মথুরানাথ হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, এস বাবা, এখন; তোমার বাবাকে রাজি করেছি।

দীনেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণত হইয়া চলিয়া আসিল; জ্যেষ্ঠতাত জ্ঞানে মথুরানাথকেও প্রণাম করিতে সে ভুলিল না। মথুরানাথ কল্যাণীয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

বজ্রাদপি এবং সংক্ষিপ্তভাষ কঠোরতা মহেশ্বর কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়াছেন, এই কথোপকথনে তাহাই যেন মনে হয়। কিন্তু এই নমনীয়তা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে—মথুরানাথ প্রভৃতি সালিশগণ

তাঁহাকে ভিজাইয়া তুলিয়াছেন। উঁহারা আধুনিক জগত-প্রগতির এবং জগত-চিত্তের খবর রাখেন; উঁহারা মহেশ্বরকে বুঝাইয়াছেন যে, এ-যুগের ছেলেদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বিবাহ সম্বন্ধে, পিতৃদর্পে জোর জবরদস্তি করা অতর্কিত সংকটসম্ভাবনায় কঠিন আর বিষম দায়িত্বের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের মন বুঝা অসম্ভব।...পিতার কথার অবাধ্য হইবার দুঃসাহস পুত্রের নাই; সুতরাং ধরা যাউক, পিতার আদেশে বিবাহ সে করিল; কিন্তু স্ত্রীকে যদি সে বিষচক্ষে দেখে! তার ইচ্ছাপূরণের পথে বিঘ্নরূপিণী বলিয়া স্ত্রীকে যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করে!... আগে স্বামী ছিল দেবতা; স্ত্রী তার সাক্ষাৎ পাইলেই বর্ত্তিয়া যাইত; কিন্তু এখন স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ হইয়াছে বন্ধুত্বের—অর্থাৎ গুরু-শিষ্যা বা প্রভু-দাসী বা দেবতা-সেবিকা সম্পর্কে পদধূলি আর আশীর্ব্বাদ না হইলেও চলে, কিন্তু সখা-সখীর প্রাণ-বিনিময় না হইলে বিবাহই বৃথা হইয়া যায়।...অনিচ্ছুক স্বামীত্বের অধিক বিড়ম্বনা আর আছে কি! নিরপরাধিনী মেয়েটির জীবন তাহাতে বিষময় হইয়া উঠিবে না কি! তখন ত ধমকে কাজ চলিবে না।... সুতরাং উহার যেদিকে গতি সেই দিকেই বাতাস দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত পন্থা।...দীনেন্দ্র বড় ঘরের নবনীতকোমলাঙ্গ ছেলে—খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটিতে এখনও সে শিখে নাই। রওনা হইলেও সে বেশী দূর যাইতে পারিবে না—ফিরিয়া আসিবে। ...যদি না আসে, তখন ধরিয়া আনিলেই চলিবে।

মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—ধরো, মঠে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল—তারা হয়ত শপথ করিয়ে ওকে দলে নেবে; তারা সন্ন্যাসী হলেও

ন্যাকা-বোকা কাঁচা ছেলে নয়। তখন কি তাদের ভেতর থেকে ওকে ছিনিয়ে আনা যাবে?

মথুরানাথ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—যাবে বৈ কি! এটা ত হিন্দু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মরাজ্য নয়, আইনকানুনে বাঁধা ইংরেজ রাজত্ব।

—অতশত লট্‌খটে কাজ কি? না যেতে দিলেই হয়!

—এ হেঃ···এতক্ষণ বললাম কি তবে? তাতে যে উল্টো বিপত্তির ভয় রয়েছে। যে উদ্দেশে তাকে ধরে রাখা ঘরে বসেই সে তা পণ্ড করে দেবে। ওকে যেতে দাও ভাই।···কোথাও সুখ নেই এ-কথা সত্যি। তোমার ছেলে যথার্থই সৎ—তা আমিও জানি, তুমিও জানো।···যদি মঠে গিয়ে দেখে, সংসারের সঙ্গে তার তফাৎ তেমন নেই তবে সে পালিয়ে আসবে।

তারপর মথুরানাথ আরো অনেক কথা কহিয়াছিলেন···আজ-কালকার সন্ন্যাসীরা কেমন কাজের লোক তাহা বলিয়াছিলেন; তারাই সামাজিক গঠনমূলক সংস্কারে এবং দুর্গতগণের দুঃখহরণ-কল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশের নমস্য হইয়া উঠিয়াছে—

এবং তারপর মথুরানাথ এমন কয়েকটি সন্ন্যাসীর নাম করিয়া-ছিলেন যাহাদের নাম মহেশ্বরও শুনিয়াছেন।

মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—ডাকাই তাকে।

—কিন্তু রূঢ় হ'য়ো না। রূঢ় শাসন এ-ক্ষেত্রে চলে না।

মহেশ্বর তাহাতে রাজি হইয়াছিলেন—

কিন্তু মথুরানাথের অর্থপূর্ণ তর্ক এবং সতর্কীকরণ তত কাজে লাগে নাই যত কাজে লাগিয়া গেছে তাঁরই অন্য একটি কথা—কথাটা মহেশ্বরের চিন্তনীয়।

৩৬

মহেশ্বর দম্ভপরায়ণ চিরকাল; তাঁর টাকার দম্ভ আছে, সংসারের কর্ত্তা হিসাবে দম্ভ আছে, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হিসাবে, সুসন্তানগণের জনক হিসাবে দম্ভ আছে, বংশপরম্পরার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসাবে দম্ভ আছে—বংশগৌরবজাত দম্ভ ত তাঁর শিরায় শিরায়—

সুতরাং তাঁর মনে হইল, পুত্র যদি সন্ন্যাসগ্রহণকরতঃ কৃতকর্ম্মা হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে তবে তিনি নিজের প্রভু-ইচ্ছাকে সম্বরণ করিতে পারেন। বংশের বৃদ্ধির চাইতে, ব্যক্তির সুখের চাইতে, বংশের গৌরববৃদ্ধি শ্রেয়ঃ।

দীনেন্দ্র গৃহত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছে শুনিয়া অন্তঃপুরে কান্নাকাটি লাগিয়া গেল। এতদিন কান্নাকাটি লাগে নাই, মহেশ্বর মিত্র সম্মুখে তাঁহার পাষাণ-আসনে উপবিষ্ট আর তাঁর অটল ইচ্ছার পাষাণ-প্রাচীরে বেষ্টন করিয়া ছিলেন বলিয়া···তিনি নির্গমের রন্ধ্র দিতেই অন্তঃপুরের সম্মুখে শূন্য ছাড়া আর কিছু রহিল না।

অন্তঃপুরে আগুন লাগিলে মহেশ্বরকে বহির্ব্বাটি হইতে ডাকিয়া আনা যাইতে পারে—লঘুতর কারণে তাঁহাকে আসনচ্যুত করা নিষিদ্ধ; কিন্তু আজ অসিতার হুঁস রহিল না—স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে তলব করিলেন···

মহেশ্বর আসিলেন—

অসিতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

—উপায় কি ! বাধা দে'য়া বিপদজনক।

—একি বেড়ালের বাচ্চা যে বস্তায় পুরে নদীপারে রেখে আসবে ? শুনলাম, তাকে মঠে নিয়ে পৌঁছে দে'য়া হবে ! তোমার ইচ্ছে হয়েছে তাই ; কিন্তু তোমার ইচ্ছাই চরম বলে আমি মানব না তা জানো ?

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মহেশ্বর মিত্র খানিক কি ভাবিলেন ...বোধ হয় ভাবিলেন, মার্জ্জারী ক্ষেপিয়া গেছে।...বলিলেন,— তুমি রত্নগর্ভা তা কেবল আমিই স্বীকার করি, আর আমার যারা অনুগত হিতৈষী পরিচিত তারাই তা স্বীকার করে, কিন্তু দেশের লোকে তা জানে না। আমি নিজের পুত্র দেশের দশজনকে দান করলাম—আমার পক্ষে এ মুষ্টিভিক্ষা দান, কিন্তু শক্তি যদি ওর থাকে তবে বংশের মুখোজ্জ্বল ও করবে। তুমি বাধা দিও না, ও যাবে। বলিয়া মহেশ্বর প্রস্থানের উপক্রম করিয়াও প্রস্থান করিলেন না ; পুনরায় বলিলেন,—আমাদের ইচ্ছে হ'লে ওকে দেখে আসব ; ওর ইচ্ছে হ'লে আমাদের দেখে যাবে। বিদেশে চাকরী করতে বেরুলে যে অবস্থা হয় ঠিক তাই। ধরো তোমার ছেলে দূরদেশে চাকরী করতে যাবে। বলিয়া মহেশ্বর সম্মুখস্থ কয়েক জোড়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সম্পূর্ণ প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের যে স্বয়ংক্রিয় বিভীষিকা আছে তাহা অসিতার ঘুচিল না—অর্থাৎ তাঁর মনে হইল, সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করা আর বিদেশে চাকুরী করিতে যাওয়া একই কথা নহে।...পার্ব্বতীর দিবসত্রয়ের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া দশমীর

দিনে পুনরায় কৈলাসভবনে প্রত্যাগমনে তাঁহার মায়ের যে ক্রন্দন তাহা যেমন সকল কন্যার মায়ের, শচীমাতার নিমাইয়ের জন্য ক্রন্দনও তেমনি সকল মায়ের না হোক, যে ছেলে ঐ পথের পথিক তার মায়ের বটে। অসিতা স্বামীর ধাত চিনিতেন; তাঁহার উপর যখন নির্ভর করিয়াছিলেন তখন কোনো ভাবনাই ছিল না; এখন তাঁহার উপর আর নির্ভর করা যাইতেছে না দেখিয়াই অসিতার হতাশার কিছু বাকি রহিল না···যশের লোভ আর গৌরববৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তখন পুত্রকে বলি দিতে তাঁহার প্রাণ একটুও কাঁপিবে না। অসিতার আকাশ কালো হইয়া উঠিল—তিনি ছুটিলেন পুত্রের কাছে—তাঁহার সঙ্গে গেল শতদল প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র পূবের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিল। তখন চন্দ্রোদয় হইতেছে···বনানীগভীর দিক্‌প্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানা কালো গাঢ় মেঘ ছিল—তাহা গৈরিক বর্ণ ধারণ করিল···দেখিতে দেখিতে মেঘশীর্ষে ছটা ফুটিল··· চন্দ্রমণ্ডলের সূক্ষ্ম কলাপ্রান্ত দেখা দিল···এবং তারপরই যেন চন্দ্রদেব লাফাইয়া লাফাইয়া মেঘান্তরালের বাহিরে আসিয়া স্বচ্ছ নীলিমার গায়ে ভাসিতে লাগিলেন···

দীনেন্দ্রের মনে হইল, ঐ মেঘখানা মুখের উপর ছিল বলিয়া রুদ্ধশ্বাস চন্দ্র যেন তাহাকে ছাড়াইয়া আসিতেই তাড়াতাড়ি করিয়াছে—এখন ত বেশ গতিহীন স্থির হইয়া আছে!···এই দৃশ্যটিকে সূত্র করিয়া একটি দার্শনিক চিন্তার উদয় হইল—

পরব্রহ্ম আর আত্মার মাঝখানে যতক্ষণ সংসারের কালিমা

বিরাজ করে ততক্ষণই—'কই আলো, কই আলো' বলিয়া রুদ্ধশ্বাস মুক্তিকামী মানবের আর্ত্তনাদ উঠে—সে কালিমা দূরীভূত হইলেই আত্মা অসীমের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া ভূমানন্দে নিমগ্ন আর নিস্পন্দ হইয়া যায়···

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া দীনেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল···

অসিতা উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে আসিল শতদল প্রভৃতি।···দীনেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল···ভূমানন্দলাভের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া সে জগজ্জননী জ্ঞানে জননীকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল—

কিন্তু অসিতা যত কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া তার একটিও তাঁর মুখে ফুটিল না—ছেলের মুখের দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন···সত্মোথিত জ্যোৎস্না পড়িয়া পুত্রের মুখ পাণ্ডুর দেখাইতেছে···বিচ্ছেদভয়ে অস্থির-চিত্তে অসিতার সহসা মনে হইল, দিন যত যাইবে মুখের এই পাণ্ডুরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া একদিন প্রাণের জ্যোতিঃ একেবারে নিবিয়া যাইবে—আর সেই নিদারুণ অকাল-নির্ব্বাণ তাঁর সম্মুখে ঘটিবে না।

অসিতা তথাপি আত্মসম্বরণ করিলেন ; বলিলেন,—তুই পেটে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেন নতুন ছেলের আমার বুকের দুধে রুচি নেই—আমাকে ঠেলে ঠেলে দিয়ে সে কেবলি—

ছেলে পর হইয়া যাইবে এই ব্যথায় ক্রন্দন যেন বুক ভরিয়া ঢেউ তুলিয়া আসিল···কথার মাঝেই অসিতা নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

দীনেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—তোমার স্বপ্ন সত্য নয়, মা ; সত্য হয়নি। তোমার দুধ খেয়েই আমি বড় হয়েছি। এখনও তোমার দে'য়া যে-অন্ন আমি খাই তা তোমার দুধের মতই মিষ্টি আর অত্যাজ্য।"

—তবে ?

—যে দুধ খাইয়েছ তার শক্তি কি ঘরে বসে অপচয় করব, মা! তোমার দুধ রক্তে যে অমৃত ঢেলে দিয়েছে সেই অমৃত আমি বিতরণ করতে চাই। তোমার চরণ স্মরণ ক'রে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নামছি, মা। তুমি জগদ্ধাত্রীর স্বরূপ তা কি আমি জানিনে!

—কিন্তু তোকে যে দেখতে পাব না!

—যখনই আদেশ করবে সম্ভব হলে তখনই তোমার চরণ দর্শন ক'রে যাব।

যে মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে দীনেন্দ্রের পত্র-ব্যবহার চলিতেছে তিনি ঐ অনুমতি দিয়াছেন।

শতদল বলিল,—মায়ের দুধ একা তুমিই খেয়েছ! আমরা খাইনি ?

—কিন্তু আমি তার সাথে মায়ের দাসত্বের বর ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।...এক আকাশ থেকেই বৃষ্টি পড়ে, শিলা পড়ে, তুষার পড়ে, আবার বাজও পড়ে।...মা যাকে যে রূপ দিয়ে বা'র করতে চান সেই রূপ নিয়ে সে বেরুবে। এতে তর্ক নেই।

শতদল মনে মনে গর্জ্জন করিয়া ভাবিল,—বড় বড় কথা সব!

মা কাঁদিতেছেন, জ্যোৎস্নালোকে তাহা দেখা গেল।

দীনেন্দ্র বলিল,—তুমি ব্যথা পেয়ো না, মা ; আমাকে তুমি ত

হারাবে না, বেশী ক'রে পাবে।...তোমার ধ্যানই হবে আমার পাথেয়।

চোখের জল মুছিয়া অসিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কবে যাবি?

—দেরী আছে এখনও মাস তিনেক।

তিন মাস পূর্ণ হইতে আর সাতদিন বাকি।

অসিতা মনে মনে আশা করিয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে একটা বিঘ্ন, অথবা পুত্রের মতির পরিবর্ত্তন ঘটিবেই—কারণ বিধাতা বধির নন, আর মায়ের প্রাণ অহরহঃ সকাতরে তাহাই প্রার্থনা করিতেছে।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটে নাই, পুত্রের মতির পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাষ্ট্র হইয়া গেছে যে, মহেশ্বর মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র দীনেন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক সত্বরই গৃহত্যাগ করিবে—পিতামাতার সম্মতি পাইয়াছে।

লোকে বলিল, মহেশ্বর মিত্রের সবই অদ্ভুত।

কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে যে অলৌকিক, মহিমা না হোক, প্রহেলিকা সংযুক্ত হইয়া আছে, যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা, সার্থকতা অসার্থকতা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে পড়িয়াও লোকে সেই জন্মেই উদাসীন থাকিতে পারিল না। ভণ্ড আর সমাজের গলগ্রহ মনে করিয়া লোকে সন্ন্যাসীকে অনাদর করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারে নাই; ওরা অনেক ইচ্ছাকে অতৃপ্ত রাখে এবং যথেষ্ট

শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে ইহা ত ঠিকই। তারপর, দীনেন্দ্র ধনীর দুলাল—একেবারে সম্মুখে ধৃত অনন্ত ভোগের আয়োজন ত্যাগ করিয়া সে যাইতেছে—

সুতরাং ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল—

ধূমধাম করিয়া আসিয়া কতজন দীনেন্দ্রকে দেখিয়া গেল, আর সুখ-দুঃখ উৎসাহের কত কথা কহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। বাড়ীর লোক যাঁহারা কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, এ যাওয়ায় গৌরব আছে।

ওদিকে মথুরানাথ কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া দীনেন্দ্রের বিদায়োপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন করিলেন—বাড়ীশুদ্ধ লোক যাইয়া খাইয়া আসিল।···তাঁহার দেখাদেখি আরো অনেকে খাওয়াইল, এবং সকলের শেষে দীনেন্দ্রকে খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তর্কবাগীশ মহাশয়। তাঁহার ব্রাহ্মণী আসিয়া সসন্তান বড়বধূকে এবং শতদলকেও নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

শতদল সাজিয়াছে—

অলঙ্কারে, বসনে, বর্ণে, রূপে, স্বাস্থ্যে, অপরূপ ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়া দর্পণে নিজের সর্ব্বাঙ্গের প্রতিবিম্বটি একবার দেখিয়া লইতে সে এই ঘরে আসিল···দেখিল, দীনেন্দ্র দর্পণের সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, অতিশয় অন্যমনস্কভাবে—দর্পণের দিকে তাকাইয়া সে কিছুই দেখিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে পদচারণা করা তার অভ্যাস, পদচারণা করিতে করিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়াও তার অভ্যাস।

শতদল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—

কিন্তু প্রথমেই তার চোখে পড়িল, তাহাদের পিতামাতার যৌবনের সেই চিত্রখানার প্রতিচ্ছায়া—আলোকোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দর্পণের অভ্যন্তরে যেন জীবন্ত একটা আলোক বিকিরণ করিয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে···চিত্রের চারিটি চক্ষুতে মোহের আবেশ···আর তাহারই নিম্নে তাহারা দু'জন, পিতামাতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

দীনেন্দ্রও একবার ছবির ছায়ার দিকে চাহিয়া নিজেদের ছায়ার দিকে চাহিল···

হঠাৎ ছায়া কায়া একাকার করিয়া দিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখটা যেন একটা কুজ্ঝটিকার অস্বচ্ছ আবরণে বুজিয়া আসিল···দৃষ্টি জড়াইয়া গেল···হৃদ্‌পিণ্ডে একটা স্পন্দন উঠিল···

একটি মুহূর্ত্ত মাত্র—তারপরই দীনেন্দ্র পিছন ফিরিয়া চলিয়া আসিল—

মায়ের কাছে আসিয়া বলিল,—আমার কোথাও যাওয়া হ'ল না, মা। বিয়ে করব।

রসাভাস

মার খাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—তোর ভাত আর আমি খাব না। তোর ভাতে আমি···

বলিয়া স্বামীর অন্নের উদ্দেশে—যাহা খাইয়া আজ প্রায় সাত বৎসর সে জীবনধারণ করিয়াছে তাহারই উদ্দেশে—অকথ্য এক কাণ্ড করিয়া, আর সেই সঙ্গে স্বামীর দিকে বাঁ পা তুলিয়া সূর্য্যমুখী একদৌড়ে পিত্রালয়ে আসিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। পিত্রালয় মাত্র আড়াই মিনিটের পথ। সূর্য্যমুখীর বয়স যখন নয় তখন মুকুন্দের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু শুভকর্ম্ম আর গ্রন্থি হিসাবে তাহা তেমন সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। যৌবন দেখা দিবার পরও মার খাইয়া এবং সেই যন্ত্রণায় রাগ করিয়া সে ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার পিত্রালয়ে মাতৃ-ক্রোড়ে চলিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু আর না ফিরিবার এমন সুদৃঢ় পণ লইয়া সে কোনদিন দৌড়াইতে সুরু করে নাই, স্বামীর ভাত খাইতেও অস্বীকার করে নাই, পা-ও দেখায় নাই। আজকার ব্যাপার সুতরাং অসাধারণ—এবং তার কারণ আছে।

সূর্য্যমুখী এখানকার হরিজনবর্গের একটি পুরনারী। উহাদের গার্হস্থ্য ব্যাপারে যতই অপরিচ্ছন্নতা থাক্, কাজে দীর্ঘসূত্রতা, কথায় অকারণ দৈর্ঘ্য, অর্থের খর্ব্বতা যতই থাক্, আর তা'

যতই সহজ হোক্‌, বিবাহবিচ্ছেদের মত অচ্ছেদ্য ছেদনের সুকঠিন কাজটাও ওদের খুব সরল আর সংক্ষিপ্ত—মাত্র জিহ্বার দ্বারাই বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে; এ-দিক্‌ দিয়া তাহারা কাহারও কৃপার পাত্র এ-কথা তারা মনে করে না। স্বামীর অন্নে উদরপূর্ত্তি করিতে অস্বীকার করাই সূর্য্যমুখীদের অলিখিত দাম্পত্য-আইনের কেতাবের বিবাহবিচ্ছেদের চূড়ান্ত বিধি—আপীল নাই; নিষেধাজ্ঞা চলিবে না।

কলহ উহাদের প্রত্যহই হইত, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ইহাই যে, রসিকের মনোজ্ঞ হইয়া কখনই তা' লঘুক্রিয়ায় দাঁড়ায় নাই—

তার কারণ, সূর্য্যমুখীর যৌবন অতীব প্রদীপ্ত; তদুপরি তার রূপ আছে। ঐ যৌবন আর রূপই হইয়াছে যত সঙ্কট, সম্ভ্রমনাশ আর বালাইয়ের হেতু। স্ত্রী রূপযৌবনশালিনী হইলেই তাহার সঙ্গে কলহ করিতে হইবে, এ কথার মানে হয় না; কিন্তু সেই রূপ আর যৌবনকে যদি নিগূঢ় লজ্জার আবরণে আর নির্ম্মম ঘৃণার কণ্টকে নিজের তরফ হইতেই বেষ্টিত করিয়া না রাখা হয় তবে মস্কিল ঘটে তখন। এদিকে স্বামী মুকুন্দলাল স্ত্রীকে পাহারা দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া গেছে—ওদিকে সূর্য্যমুখীরও শাস্তি কম নয়—শাশুড়ী খোঁটা দিয়া দিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে…

আবার অন্যদিকে প্রতিবেশিনীদের কৌতুক ঈর্ষার অন্ত নাই—একটি নামের দিকে ইঙ্গিত তারা হামেসাই করে…হাসে, আর গঞ্জনা দেয়।

সূর্য্যমুখীর মায়ের সঙ্গে সূর্য্যমুখীর শাশুড়ীর সেদিন অত্যন্ত চুলোচুলী হইয়া গেছে—সে-ই নাকি ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতেছে;

সে-ই আশ্রয়, সে-ই মধ্যবর্ত্তিনী…আরও অসহ্য যাহা তাহা এই যে, পয়সা তাহারই ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

কিন্তু ঘটনা সত্যই—

যাহা স্বচ্ছ শিথিল যবনিকার আড়ালে গোপনে চলিতেছিল, আর যাহা মুখ অর্দ্ধেক ফিরাইয়া স্বল্প ভাষায় অস্বীকার করা চলিতেছিল, উক্ত বিবাহবিচ্ছেদের পর দু'দিন যাইতেই তাহা ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিল—গোপন বা অস্বীকারের কাজ রহিল না… সূর্য্যমুখী নিজেই কলহাস্যের সহিত কলকণ্ঠ মিশ্রিত করিয়া, আর নানা বস্ত্র অলঙ্কারের ঘটাসহ সাহঙ্কারে সেই কলঙ্ক লইয়া উল্লাস করিতে সুরু করিয়া দিল—প্রকাশ্যে।

শ্রী গৌরগোপাল দত্তের সিন্ধুকে যত টাকা, প্রাণে তত সখ, আর মুখে তত হরিনাম। দত্তের টাক্ পড়িয়াছে, কিন্তু চাঁদি একেবারে শূন্য হইয়া যায় নাই—নগণ্য কয়েকগাছা চুল বাতাস লাগিলে চাঁদির উপর ফুর্ ফুর্ করিয়া ওড়ে; বাতাস বহিতে না থাকিলে তাহারা শুইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের সংহতি-শক্তি সম্বন্ধে চৈতন্য নাই—সেই কারণেই তাহারা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দত্তের চাঁদির মসৃণতা এক নিমিষেই লোকের চোখে পড়ে। দত্তের গায়ের রং কালো, ঘাড় খাট, চোখ ছোট আর কটা; দুটি ভুরুর মাঝখানে অকারণে খানিক চুল জন্মিয়া ভুরুতে ভুরুতে লাগালাগি হইয়া গেছে লোকে বলে, দত্তের অগাধ ধনের আর ধনের অচলতার কারণ উহাই। দত্তের বয়স চুয়াল্লিশ।

এই দত্তের পিতা নিতাইসুন্দরের ছোট্ট একখানা কাপড়ের দোকান ছিল; অল্প পুঁজি, অল্প আয়—নিতাইয়ের পরণের কাপড় কখনো তার হাঁটুর নীচেয় নামে নাই। কিন্তু এখন? ঐ যে সুবৃহৎ ইষ্টকালয়—উহা গৌরগোপালের স্বকৃত। পৈত্রিক ছোট্ট দোকানখানাকে গৌরগোপাল এত বাড়াইয়াছে যে, তাহা এখন শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বনস্পতিতুল্য বিরাট্ বস্তু, এবং সেই বনস্পতিকে এখন পিতৃরোপিত চারাটির শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত পরিণাম বলিয়া চিনিতে যেন ইচ্ছাই হয় না।

দত্তের প্রণয়িনী-বিলাসও পৈত্রিক ধারা—সে কিছু বাড়াইয়াছে—এদিকেও সে স্বনামধন্য। পিতা নিতাইসুন্দর ছিল একনিষ্ঠ—পুত্র গৌরগোপালের পক্ষে এত নৈষ্ঠিকতা রুচিকর নহে।

যাহাই হউক, গৌরগোপালের টাকা অনেক; তার দোকানের খরিদ বিক্রয়ের "ঝঞ্ঝাটে" কর্ম্মচারীদের স্নানাহারের সময় নাই; এবং দোকানের নিম্নতম কর্ম্মচারী সেবাদাস পালও লাভের অংশ চুরি করিয়া জমিদার হইয়া গেছে।

গৌরগোপাল সেদিন সাত বৎসরের দৌহিত্রীটিকে লইয়া ভূজঙ্গধরের চালে'র আড়তে মাধ্যাহ্নিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়াছে…

নীহারবালা অবশ্য নিজের পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছে না—ভৃত্য হারাণ তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে। নীহারের নূতন আর লাল রঙের ছোট্ট ছাতাটা মুড়িয়া হারাণ হাতে করিয়াছে;

কিন্তু এ-ব্যবস্থা নীহারের মনঃপূত হয় নাই—সে বায়না ধরিয়াছে সে হাঁটিয়া যাইবে···যখন কাপড় পরিয়া আসিয়াছে এবং ছাতা আনা হইয়াছে তখন অনন্যপরবশ হইয়া সে পদব্রজে যাইবে না কেন! দাদামহাশয়ের মত খোলা ছাতাটা মাথায় দিয়া সে যাইবে। নিমন্ত্রণে যাওয়ার সমারোহটা উনি একাই, কেবলমাত্র উনিই, ভোগ করিবেন কেন? তাহাকে স্বাবলম্বী হইয়া মিছিলে যোগদান করিতে না দিয়া তাহাকে ঠকান' হইবে কেন?···এই সব তর্ক তুলিয়া নীহারবালা হারাণের কাঁধের উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল···

কিন্তু হারাণ তার পা দু'খানা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আপত্তি করিল; বলিল,—তুমি হেঁটে যেতে পারবে ক্যানে অত দূরের পথ? হোঁচট্‌ খেয়ে পড়বে মুখ থুবড়ে'—ঠোঁট যাবে কেটে'—ভোজ খাওয়া হবে না।

কিন্তু নীহারবালা ভ্রমণানন্দের তুলনায় ভোজনানন্দকে তুচ্ছ মনে করে; ঠোঁট কাটিবার ভয় সে করিল না; বলিল,—না, তুমি নামিয়ে দাও আমাকে। আমি হেঁটেই যাব। পড়ি পড়্‌ব।

হারাণ তবু বলিল,—উঁহুঁ।

গৌরগোপাল এতক্ষণ উহাদের বাকবিতণ্ডা গ্রাহ্য করে নাই; কিন্তু মেয়েটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিতেছে মনে করিয়া এইবার সে ধমক দিল; বলিল,—হারাণ, দে ছুঁড়িকে রাস্তায় নামিয়ে—চলুক হেঁটে—মরুক ছুঁড়ি আছাড় খেয়ে। অবাধ্য ছুঁড়ি।

শুনিয়া নীহার বলিল,—হারাণ, নামিয়ে দাও—দাদামশায় ত' বল্‌লে!

হারাণ হাসিয়া বলিল,—বাবু রাগ করেছেন—দেখ্‌তে পাচ্ছ না!

নীহার বলিল,—ভারি ত' বাবুর রাগ !···তারপর সে গৌর-গোপালের উদ্দেশে বলিল,—ছুঁড়ি ছুঁড়ি করো' না বল্‌ছি···ভারি ছুঁড়ি ছুঁড়ি করা হয়েছে !

খেলার সঙ্গিনীরা কেহ ছুঁড়ি বলিলে নীহারের রাগ হয়।

গৌরগোপাল নীহারের রাগে কর্ণপাতও করিল না, তেম্‌নি চলিতে লাগিল···হারাণও আবার একটু হাসিয়া তেম্‌নি চলিতে লাগিল···

এমন সময়, চলিতে চলিতে, চারা একটা খেজুর গাছের ছুঁচাল' পাতার খোঁচা বাঁচাইয়া মোড় ঘুরিতেই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী গৌরগোপালের চোখে পড়িল সূর্য্যমুখী···

সূর্য্যমুখী সেদিন মায়ের কাছে খালি বেড়াইতে আসিয়াছিল।

শাস্ত্রের মতে গৌরগোপালের, আত্মিক জীবনে নয়, নশ্বর দৈহিক জীবনে এখন শিথিলতার যুগ আসিয়াছে—পরীক্ষায় হয় তো তা' ধরাও পড়ে ; কিন্তু সেটা কেবল গড়পড়তার হিসাব··· হস্ত-পদাদি কোন বিশেষ অঙ্গকে, কিম্বা চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়কে খর্ব্ব করিয়া তার বয়স চুয়াল্লিশে পৌঁছায় নাই··· আর, গৌরগোপালের দৃষ্টি চিরকালই প্রখর—দোকানে চুরি ছাড়া আর সবই তার চোখে ভাল করিয়াই পড়ে—

সুতরাং সূর্য্যমুখী তার চোখে পড়িল, এবং চোখে পড়িতেই গৌরগোপালের স্বতঃই মনে হইল, আশ্চর্য্য রূপ !

বিশালকায় অশ্বত্থ বৃক্ষটি আকাশে পল্লবছত্র বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···তাহার নীচে একখানা ছেঁড়া চটে মোড়া ছাপ্পর লাগান' গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে···একটি ছাগল চরিতেছে—

সঙ্গে তিনটি বাচ্চা—আর কোথাও কিছু নাই···স্থানটাতে একটি মিতস্পৃষ্ট নিভৃতির ভাব অচঞ্চল হইয়া বিরাজ করিতেছে···সকল বস্তুর সাধারণ বিন্যাসকে স্বচ্ছতা আর আলোক-প্রাণ দিয়া একটা আন্তরিক অব্যাহত অর্থে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে উহার রূপ···

এই শব্দহীন নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমুখী যেন তার অবিনশ্বর অনন্ত রূপের ডালি উপরে আকাশ আর নিম্নে দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত লীলাকৌতুকভরে প্রসারিত করিয়া দিয়া প্রকৃতির আলো-ছায়ার অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছে···অতি-মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে যেন তার অতি-জীবন্ত বক্ষ-স্পন্দনের যুগ্ম-নৃত্য চলিতেছে···পল্লবের সির্ সির্ মর্ম্মর-তরঙ্গে যেন রূপোপভোগের রোমাঞ্চ বহিতেছে···

গৌরগোপাল এক নিমেষেই রোমাঞ্চিত হইয়া গেল···সূর্য্যমুখী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল···গৌরগোপালের তৎক্ষণাৎ মনে হইল, গৃহপালিতা এই নারী তার "অবশ্য প্রতিপাল্য।"

সূর্য্যমুখীর ভাগ্যোন্নতির সূত্রপাত ঐখানেই, অর্থাৎ তাহার গৌরগোপালের চোখে পড়িবার আর চোখে ভাল লাগিবার ইতিহাস ঐ। তারপর আর সব খুবই সহজ। টাকা যেখানে অগ্রগামী, চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকার যেখানে, কান টানিলে মাথার মত, অক্লেশেই আসা সম্ভব, সেখানে প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কায় কম্পিত-কলেবরে বিশেষ করিয়া মনোরঞ্জনের জন্য পদধারণের প্রয়োজনই হইল না···প্রেম-নিবেদন প্রভৃতি বাজে

জিনিষের স্থান সেখানে ত' নাই-ই। এক কথায়, অগ্নির সহায় যেমন বায়ু, ইচ্ছার সহায় তেম্‌নি টাকা। টাকা চাই-ই—দুর্দ্দিনের জন্য চাই, সুদিনকে ফুটাইবার জন্য চাই, পরকে দেখাইবার জন্য চাই, নিজে দেখিবার জন্য চাই।

সুতরাং আরো দু'দিন সহিয়া থাকিয়া সূর্য্যমুখী পরমগুরু পতিকে পা দেখাইয়া মায়ের কাছে চলিয়া আসিল—

তা' ত' আসিলই ; তার উপর, সূর্য্যমুখীর রূপের দেমাকের উপর টাকার দেমাক্ পড়িয়া তার পা ফেলাটাই দেখিতে দেখিতে অন্যরূপ হইয়া গেল। বাজাইয়া বাজাইয়া নগদ টাকা সে শত্রু মিত্র কাহাকেও দেখায় না বটে ; কিন্তু বস্ত্র দেখায়, অলঙ্কার দেখায়···তাহা দেখিয়া, আর তাহার অহঙ্কার দেখিয়া বাগ্দীপাড়ার কুরূপা আর ভাগ্যহীনা মেয়েগুলির নিজের গায়ের মাংস দাঁতে পিষিয়া চিবাইতে ইচ্ছা করে।

বলা বাহুল্য, গৌরগোপাল নিত্য আসে—

সেবাদাস প্রভৃতি কর্ম্মচারীবৃন্দ সেই অবসরে তার দোকানের লাভ আরো চুরি করে।

সূর্য্যমুখীর মনে হয়, যুবকের চাইতে বৃদ্ধ ভাল ; বুড়োরা পা-ছুঁই পা-ছুঁই করিয়া আদর করিতে জানে, এবং ছুঁইতেও প্রস্তুত ; আর, আরো ভাল যে, তারা দিতে জানে।

গৌরগোপালের মনে হয়, দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া সে রাজা হইয়া গেছে।

সূর্য্যমুখীর আটপৌরে কাপড়েরই পাড়ের চটক্ আর জমির জৌলস দেখিয়া প্রতিবেশিনী ফণী বলে অন্য কথা ; বলে, "এখন

দেখ্‌ছিস পোড়ারমুখী গলা গলা জল ; জল একদিন নেমে যাবে— দাঁড়িয়ে থাক্‌বি তুই ততখানি পাঁকে। আমরা কিন্তু এমনি থাক্‌ব চিরকাল”...

যেন সে বর্ত্তমানে বেশ সুখেই আছে, আর ধর্ম্মপথ ছাড়া সুখ নাই।

সূর্য্যমুখী আঁচল ঘুরাইয়া চাবির রিং পিঠের উপর ঝম্ করিয়া ফেলে ; তারপর বলে, “তাই তুই থাক্—আমিও এম্‌নিই থাকি, তাতে আমার দুঃখু নাই।...পদ্ম পাঁকেই থাকে।”

লোহার চাবির মালিক হওয়া বড় গৌরবের কথা ; রিং-এ ভরিয়া তার গুচ্ছ তৈরী করা ও-পাড়ার মেয়েদের যৌবনের একটি প্রধান সখ—উহা জীবনের একটি প্রধান সম্পদ।

ফণীরও চাবি আছে, কিন্তু অঞ্চল-সমেত আবর্ত্তিত করিয়া ঝম্ করিয়া পিঠে ফেলিবার মত অত নাই ; একটি আছে—তা' আবার মায়েরও কাজে লাগে বলিয়া চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিতে হয়—

কাজেই সূর্য্যমুখীকে আঁচল-সমেত চাবি ঘুরাইতে দেখিয়া ফণীর বুক আরো হু হু করে ; নির্ঘাৎ কথাটাই তখন বলে,— ম'লে বাঁচি।

সূর্য্যমুখী বলে,—সত্যি, ভাই ; আমার আয়ু তোকে দিলাম— নে। বলিয়া সে ডান হাতের কুসুম-কোমল আঙ্গুলগুলি জড়ো করিয়া তাহার দিকে নিজের অদৃশ্য পরমায়ুকেই যেন ছুড়িয়া দেয় ...তারপর বিদ্যুৎ-চমকের মত তীক্ষ্ণ একটু হাসিয়া চঞ্চল দেহ-খানাকে নৃত্যের ভঙ্গিতে দোলায়িত করিয়া ফণীর একেবারে গায়ের কাছ দিয়া সুবর্ণ মৃগীটির মত সে ছুটিয়া যায়।

অমনি করিয়া দিন যায়।

পুরাতন ঐ একই সূর্য্য নিত্য ওঠে, কিন্তু যখন সে ওঠে লোকে তখন তাহাকে বলে নবীন সূর্য্য...অন্ধকার দূর করিয়া জীবনের মূলে রসদান করে বলিয়াই সে চির-নবীন। গৌরগোপাল নিত্যই আসে—নিত্য নব উপহারের অঞ্জলি লইয়া সে আসে—অভাব বলিতে সে কিছুই রাখে নাই, কিন্তু সূর্য্যমুখীর তাহাকে নিতুই নব মনে হয় না...

গৌর যেন অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহার নাগাল পাইতেছে না...

সূর্য্যমুখী মনে মনে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল, তারপর একটু ছট্‌ফট্‌ করিল...তারপর এমন হইল যে, গৌরগোপালের কথা ভাবিতে গেলেই বিতৃষ্ণায় তার মুখ যেন আপনিই অন্যদিকে ফিরিয়া যায়।

এমন সময় তার দেখা হইয়া গেল হৃদয়নাথের সঙ্গে।

বর্ষার দিন; গত রাত্রের প্রচুর বৃষ্টিতে সদর রাস্তায় কাদা হওয়ায় হৃদয়নাথ একটু ঘুরিয়া এই পথে কি কাজে চলিয়াছিল... তার মাথায় ছিল ছাতা, এবং তার চোখে পড়িল সূর্য্যমুখী; এবং না বলিলে ভুল হইবে, সূর্য্যমুখীরও চোখে পড়িল সে...

হৃদয়নাথের হৃদয় হইতে উঠিয়া মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল একটি শব্দ, "ইস্‌"!...তারপর সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যমুখীকে দেখিল, এবং লক্ষ্য করিল যে, সূর্য্যমুখীও তাহাকে না দেখিতেছে এমন নয়।

গৌরগোপাল সূর্য্যমুখীকে দেখিয়াছিল ভরা মধ্যাহ্নে, খর

রৌদ্রের সময়—হৃদয়নাথ তাহাকে দেখিল জলদস্নিগ্ধ অপরাহ্নে, কিন্তু একই স্থানে, সেই গাছের নীচে। সেদিন সূর্য্যমুখী বৃক্ষের ছায়ালিঙ্গনের মাঝে দাঁড়াইয়া অপরূপ রূপের প্রবাহ দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের মত অনন্তে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল—রৌদ্রকে মণ্ডিত করিয়াছিল কষিত কাঞ্চনে—

আজও তাই—

আজও সে জলদের ঘন ছায়ালিঙ্গনকে স্নিগ্ধতম সুরঞ্জনী প্রভায় প্রফুল্লিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—রূপ পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া গেছে।

হৃদয়নাথ ওদিকে, অর্থাৎ পয়সার মালিক হিসাবে যাহাই হউক, তাহার চেহারা "রমণী-হৃদয়জিৎ" নিশ্চয়ই···তত বলিষ্ঠ সে নয়; কিন্তু কে কোন্ অজ্ঞাত পথে আপন দুরন্ত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া চমৎকৃত বিহ্বল করিয়া রাখিয়া যায় তাহা জানি না···

সূর্য্যমুখী হঠাৎ চক্ষু নত করিল—

চক্ষুর দৃষ্টিকে নত করা তার এই প্রথম। ক্ষমতার কাছে তার মনে মনে এই পরাজয় স্বীকার একটা অভিনব সুস্বাদে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব পুলক দেখা দিল।

হৃদয়নাথ হৃদয়ে "আহত" হইয়া প্রস্থান করিল।···কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময় বাসায় ফিরিয়া হৃদয়নাথ দেখিল, সূর্য্যমুখীর মুখমণ্ডল, দেহ, বসন, হাসি, চাহনী প্রভৃতি তার অন্তর-কুহর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—অন্য জিনিষের স্থান সেখানে নাই।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সদর রাস্তার দুস্তর কর্দ্দম পরদিনই

শুকাইয়া গেল, কিন্তু হৃদয়নাথ সদর রাস্তায় না যাইয়া এই পথেই পুনরায় আসিল···পুনরায় দেখা হইল···মনের কথা আর প্রাণের আহ্বান শরীরী হইয়া উভয়েরই মুখে একটু হাসি ফুটিল।

সেদিন হৃদয়নাথ এক স্বপ্নই দেখিল—দেখিল, সূর্য্যমুখী ডোবার জলে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে···সূর্য্যমুখীর আত্মহত্যার অভিপ্রায় নিশ্চয় জানিয়াও সে নিঃশব্দে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই ডোবার ডুরুল পানাগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে···সূর্য্যমুখী হাঁটুজলে নামিল, তারপর কোমরজলে, তারপর চট্ করিয়া গলাজলে···

তারপর হঠাৎ দেখা গেল, সূর্য্যমুখীর সর্ব্বশরীর জলতলে অদৃশ্য হইয়া গেছে—তার চুলগুলি কেবল ডুরুল পানার সঙ্গে জড়াইয়া ভাসিতেছে···

দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিতা সূর্য্যমুখীকে উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিতে যাইয়া হৃদয়নাথ মুখে বু বু শব্দ করিতে করিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া একেবারে উঠিয়া বসিল···তখন স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া চিনিতে পারিয়া তার নিশ্চিন্ত হইতে বিলম্ব হইল না।

তৃতীয় রাত্রের এই ঘটনা।

চতুর্থ দিনে সকাল বেলায় হৃদয়নাথ ছাতা লইয়া, সদর রাস্তায় কাদার নামগন্ধ না থাকা সত্ত্বেও এই ঘোরা পথে চলিয়া আসিল—এবং দৈব এমনি অনুকূল যে, একেবারে মরুভূমির মত নির্জ্জনতার অভ্যন্তরে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তার দেখা হইয়া গেল···মেয়েগুলি তখন ঘরের বাসি কাজ সারিতেছে, পুরুষগুলি মদের অবসাদে তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই—যাহারা উঠিয়াছে তাহারা মাঠে গেছে,

ঘাট হইয়া ফিরিবে…দু'টি পাখী ছাড়া বৃহত্তর প্রাণীর ছায়াও সেখানে নাই।

এই নির্জ্জনতার মাঝে পড়িয়া হৃদয়নাথ সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিল…

যে-কথাটা হৃদয়নাথের হৃদয়নাথ ছাড়া কেহ জানিত না, অথচ ব্যাপার এম্‌নিই কোহিনুরের মত মূল্যবান, সূর্য্যের মত জ্বলন্ত, আর আগ্নেয়গিরির অগ্নির মত বিদারক যে, তাহার মনে হইত, পৃথিবীতে জন্মিয়া অবধি যত কথা বলিয়াছে, বলিতে পারিলে সেই কথাটাই সকল কথার শিরোভূষণ হইয়া উঠিবে, সেই জ্বালাময় দুঃসহ কথাটা সে সূর্য্যমুখীর সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল; বলিল—"আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

সূর্য্যমুখী বলিল,—"আমিও।" বলিয়া হাসিল।

শুনিয়া চক্ষের নিমেষে হৃদয়নাথ যেন সোনা হইয়া গেল। আকাশের ওপারে যে অগম্যতম আর বাঞ্ছিততম আর ফুল্লতম দেশ আছে, আকাশ হঠাৎ দু'চির হইয়া যেন সেই সর্ব্বলোকোত্তর লোক হইতে চ্যুত শব্দটি একটি প্রগাঢ় চুম্বনের মত তার চির-তৃষিত ওষ্ঠপুটে পড়িল…সেই শব্দ-রত্নটির বিনিময়ে সৌরজগৎসহ পৃথিবীকে ক্রয় করা যায়, এম্‌নি জিনিষ সূর্য্যমুখীর মুখের ঐ কথাটি, আর এম্‌নি তা' অনুগ্রহের দান—অমন দুর্লভ অমূল্য যার রূপ সে কিনা বলে, আমিও!

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া যেন শীত করিতে লাগিল।

…ঠিক হইয়া রহিল, গৌরগোপাল প্রস্থান করিবার পর, অর্থাৎ রাত্রি সাড়ে দশটার পর, গাড়ীখানা চলিয়া গেলে, হৃদয়নাথ আসিবে—

গৌরগোপালের উদ্দেশে হৃদয়নাথ মনে মনে বলিল,—বুড়ো। সর্প মূর্ত্তিমান খলতা, কিন্তু অদৃষ্ট আরো খল।

হৃদয়নাথ নিমন্ত্রণ পাইয়া অকপটে কামনা করিল, রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত যেন সে বাঁচিয়া থাকে, তার আগে যেন তার মৃত্যু না হয়। ভগবান, দেখ'। তারপর হৃদয়কে সে সুসজ্জিত আর সুকোমল পুষ্পশয্যার উপর বিছাইয়া দিল—নিশীথ রাত্র হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তা' বিস্তৃত…অথচ কীটের দংশন নাই, কাঠিন্যের পীড়ন নাই। অবশ্য তার সঙ্গে রহিল সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখীর মুখের কথাটি হৃদয়নাথের মর্ম্ম প্লাবিত করিয়া শিরাপথে আরোহণ করিল মস্তিষ্কে—মদের ঢালা আগুনের মত; তারপর হু হু শব্দে পুনঃপুনঃ তার সর্ব্বচৈতন্য সম্মোহিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল… তারপর তার শিহরিত রোমের কূপে কূপে সেই শব্দেরই ঝঙ্কৃত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল…

চক্ষু অন্ধকার এবং কর্ণ বধির হইয়া রহিল—অর্থাৎ পৃথিবীতে যে আর কিছু আছে এ জ্ঞান তার লোপ পাইয়া গেল।

হৃদয়নাথের ভয় হইল, সে কি পাগল হইয়া যাইবে! এত আনন্দ অবাধে ধারণ করিতে পারে এমন প্রকাণ্ড স্থান তার হৃদয় ত' নয়। যদি মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের এই আনন্দ-বন্যা ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে পরিবেষণ করিয়া রাখিয়া আসা যায় তবু সেই অক্ষয় বস্তু বোধ হয় তেমনি পূর্ণাঙ্গই থাকে—অথচ মানুষগুলি অনায়াসে ধন্য হইয়া যায়…

কবির প্রণয়সঙ্গীতগুলি তা' ছাড়া আর কি!

হৃদয়নাথের সময় বড় কষ্টে কাটিতে লাগিল…সময় যেন

অবাধে চলিতে পারিতেছে না, কাঁটায় বিঁধিয়া পড়িতেছে—কাঁটার বাধা ছাড়াইয়া দিয়া তাহার জন্য পথ মুক্ত করিয়া দিতে হইতেছে। প্রতিক্ষণেই তার মনে হইতে লাগিল, এখন ক'টা বাজে কে জানে! বেলা এগারটার সময় তার মনে হইল, এতক্ষণ বোধ হয় একটা বাজিয়া গেছে; বেলা একটার সময় তার মনে হইল, বোধ হয় দশটাই এখনো বাজে নাই।

এম্‌নি করিয়া সময়ের হিসাবে বারম্বার গোলোযোগ ঘটিলেও এক সময় একটা নির্ভুল ক্ষণ অবশ্যই আসিয়া পড়িল। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় হৃদয়নাথের অনুভূত হইল যে, বেলা এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা হইবে; এবং তার আন্তরিক ইচ্ছা হইল, একবার ঐ দিকেই যায়—যদি দেখা হয়। কিন্তু অদৃষ্ট কি এতই প্রসন্ন বিঘ্নমুক্ত যে, যখনই যাইবে তখনই দেখা হইবে!... এবারও যদি তেমনি নির্জ্জনেই দেখা হইয়া যায়! হয়তো আবার বলিবে, "এস কিন্তু"...হয়তো সময়টা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিবে; খঞ্জন-চক্ষু নাচাইয়া বলিবে: "ঠিক সাড়ে দশটা। মনে থাক্‌বে ত'?"

সূর্য্যমুখী তখনও জানিতে চাহিয়াছিল: "মনে থাক্‌বে ত'?"

হৃদয়নাথ স্পষ্টই একটু হাসিল—

প্রশ্নটা যে কত আশ্চর্য্যজনক, অকারণ আর অসম্ভব তাহা বেচারী কিছুই জানে না। পুরুষের মন ওরা কি বুঝিবে! বোঝে না বলিয়াই ত' আরো ভালবাসিতে ইচ্ছা করে...

মনে আবার থাকিবে না! ইহাও যদি মনে না থাকে তবে মন রহিয়াছে কি জন্য! সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তা'

মনে আছে—এমন করিয়া ছাইয়া আছে যে, সেখানে আর সব থাকাথাকি নিষ্ফল অসম্ভব হইয়া গেছে।…সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে কি পৃথিবী অনুক্ষণ মনে না রাখিয়া পারে! স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া তার মূল কতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া রস শোষণ করিতেছে তাহা কি বসুমতী টের পাইতেছেন না!…সূর্য্যমুখীর ঐ প্রশ্নটির আঁশে আঁশে প্রবেশ করিয়া মন কত অমৃতের আস্বাদন, কত সুধা শোষণ করিতেছে তাহা কি মন জানে না!…এই দেহে এই মন যতদিন থাকিবে ততদিন মনের আর নড়িবার চড়িবার সাধ্য রহিবে না—ঐ প্রশ্নই তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে… এখন হইতে তাহার প্রধান কাজই হইল ঐ—ঐ প্রশ্ন এবং ঐ প্রশ্ন যেদিকে ইঙ্গিত করিতেছে তাহারই বশে চলা। মন ছাড়া আর তার স্থান কোথায়? সেই মনের ভিতর যদি আর কোনো কথা প্রবেশ করে তবে প্রবেশ করিয়াই সে অন্ধকার পাতালে বলির রাজ্যে তলাইয়া যাইবে—ঐ কথাটাই ভাসিয়া থাকিবে, যেমন ভাসিয়া থাকে পদ্ম সমস্ত পঙ্ক আর শৈবালের ঊর্দ্ধে জলের উপর।

হৃদয়নাথ ছাতাটা লইয়া উঠিয়া পড়িল…রওনা হইল…

তখন তার মনে হইল, তার নিজের নামটি বেশ—হৃদয়নাথ! পঙ্কজিনীরও সে হৃদয়নাথ বটে, কিন্তু সে স্বত্ব-স্বামীত্ব ধরিয়া বাঁধিয়া। দশজনে সভা করিয়া বলিয়াছিল, লও; সে লইয়াছিল। নেহাৎ নাচারে পড়িয়া সে হইয়াছে হৃদয়েশ্বর, তিনি হইয়াছেন হৃদয়েশ্বরী। ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কি?…বন্ধন যদি উপরপড়া হইয়া ফাঁস লাগায় তবে পনর'-আনা আনন্দ ফাঁসের টানেই মারা

পড়িয়া যায়। কিন্তু যেখানে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে কামনা করে আপনার স্বভাবজ প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেখানে হৃদয়-বিনিময় কত উপভোগ্য তাহার কি ইয়ত্তা আছে না ব্যাখ্যা আছে! মানুষ আজও সে সুখকে মাপিয়া উঠিতে পারে নাই—ঠিক্ মত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

হৃদয়নাথের মনে হইল, সকল মানুষের উপর টেক্কা দিয়া সে কিছু কিছু বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

তারপর তার মনে পড়িল শয্যাকে—অত্যন্ত বাস্তব সেই শয্যা।…গৌরগোপাল কি মলিন শয্যায় শয়ন করে! এত দিয়াছে, ভাল বিছানা দেয় নাই! কুন্দ-ধবল শয্যা, সুমার্জ্জিত পরম লোভনীয় তার রূপ…

সেই শয্যায় তাহারা দু'জন—সূর্য্যমুখী আর সে—অত্যন্ত নিভৃতে। পৃথিবীর আর সব জীবন-জাগৃতি তাহাদের দু'জনাকে ঐ নিভৃতে রাখিয়া সরিয়া গেছে…সে নিভৃতি এম্‌নি অটুট হইবে যে, বাতায়নে বায়ুর আঘাত নিষিদ্ধ, পত্রের মর্ম্মর নিষিদ্ধ, আলোক-শিখার কম্পন নিষিদ্ধ। পৃথিবী মৌন…মেঘে ঢাকা চাঁদের মত চোখের বাহিরে একটা স্থানে সে অবলুপ্ত—কাছে না থাকিয়াই সে থাকার সুখ দিতেছে—নিভৃতির পরম আনন্দ আর সময়ে দৈর্ঘ্য দিয়া পরিসমাপ্তির সুদূরতার সুধা-স্বাদ ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলিয়া উভয়কে অশ্রান্ত অনন্তের কোলে বসাইয়া দিয়াছে… অন্ধকার নিঃশব্দ জগতের একাংশে, অতলতার একেবারে প্রান্তে, তাহাদের শয্যা রচিত হইয়াছে—বাহিরের সকল চেতনা আচ্ছন্ন; কেবল তাহাদেরই বক্ষস্পন্দনে আদি-চৈতন্য প্রাণ পাইয়াছে…

নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকের উত্থান পতনে স্পর্শ বিযুক্ত আর সংযুক্ত হইতেছে, কিন্তু চেতনোল্লাসের যে স্রোত ছুটিতেছে তাহার বিরাম নাই।…পরস্পরের রক্তে পরস্পরের রক্তের উত্তাপ বিনিময়ে সঞ্চালিত করিয়া দিয়া তাহারা প্রাণের মূলে দুঃসহ আলোড়ন অনুভব করিতেছে—ব্যগ্র নির্ভীক উন্মত্ত সে অনুভূতি।

নিভৃতে তাহারা—এই অব্যাহত পরম নিভৃতিই করিবে দিশেহারা, স্পর্শকে নিবিড়তম, মিলনকে পূর্ণতম, আলিঙ্গনকে নিঃসন্দিগ্ধ আন্তরিকতায় উষ্ণতম—তাহাদের কণ্ঠকে করিবে অনুচ্চারিত শব্দে মুখর, শব্দকে করিবে অনির্ণেয় অর্থে পূর্ণ, অর্থকে করিবে অচিন্তনীয় রসে এম্‌নি মধুর যে, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ প্রবাহিত হইয়া এক সময় মূর্চ্ছার মত একটা প্রকম্পিত অসাড়তার মাঝে তাহারা বিলীন হইয়া যাইবে…

হৃদয়নাথ চলিতে চলিতেই সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিল…বুক তখন কতকটা হাল্‌কা হইল।

কিন্তু ঐ কুহকী নিভৃতিবোধ তাহাকে ত্যাগ করিল না—শান্ত মধুর অপরিসীম আনন্দময় সৃষ্টিব্যাপী ভয়হীন শব্দহীন নিভৃতি… অম্‌নি নিভৃতিই যেন তার আকাঙ্ক্ষার মুখ্যবস্তু; রমণী গৌণ… নিভৃতিই যেন রমণীর রমণীয়তা—রমণীর আত্মার আর দেহের শ্রেষ্ঠতম অশরীরী রূপ।

নিভৃতিকে ধ্যান করিতে করিতে, আর তাহাকে চাখিতে চাখিতে হৃদয়নাথ তেঁতুল-তলায় পৌঁছিয়া গেল…সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটি নিকটেই…বাঁ দিকে খেজুর ডালের বেড়া দিয়া একটি মনসাবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে…

একটি স্ত্রীলোক একটি ছাগলের গলায় আঁচল দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে; হৃদয়নাথ তাহাদের পথ দিতে মাটির একটা ঢিপির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল…

ভদ্রলোক দেখিয়া স্ত্রীলোকটি তাহাকে সালিশ মানিল; বলিল,—দেখুন ক্যানে, বাবু! বাড়ীতে হারামজাদির একডণ্ড মন বসে না…কে কোথায় শাক আউজেছে, তারি…

ছাগলের দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে আর কি অভিযোগ সে করিল তাহা হৃদয়নাথের কানে গেল না…

হঠাৎ তার মনে হইল, ফিরিয়া যাই। এ-সব ব্যাপারে, মনে যাহাই হউক, বাহিরে অতিরিক্ত উতলা হওয়া কিছু নয়; উহাদের কাছে খেলো আর নিজের কাছেই যেন কেমন পান্‌সে হইয়া যাইতে হয়…

একটু থমকিয়া থাকিয়া হৃদয়নাথের পরক্ষণেই মনে হইল, কিন্তু ছাতার আড়াল দিয়া একটিবার তাহাকে নয় সেই স্থানটাকে দেখিয়া গেলে ক্ষতি কি! দেখা যদি দৈবাৎ হয়-ই তবে সে মনে করিতেও পারে, অন্য কোনো দরকারে এদিকে আসিয়াছে।

দ্বিধা ঘুচিয়া হৃদয়নাথ অগ্রসর হইয়া গেল…

বাঁ দিকে ছোট একখানা দোচালা ঘর—হাতে রূপার বালা পরা একটি কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ ছেলে দাওয়ায় বসিয়া আছে…আর একটু পরেই ডা'ন দিকে প্রাচীর-আঁটা একখানা বাড়ী—দরজা একটুখানি খোলা আছে—একটা অতি-বাড়ন্ত গাঁদা গাছ হৃদয়নাথের চোখে পড়িল…

এইখানে পৌঁছিয়াই একটা কলরব তার কানে আসিল—তাহা মিষ্ট নয়; কথা স্পষ্ট নয়, কিন্তু সুর স্পষ্ট—অতি দ্রুত-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ তীরপরম্পরার মত সে সুর···

এবং আরো খানিকটা আগাইয়া আসিতেই যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া তার চোখের উপর দেখা দিল তেমন দৃশ্য সে অনেক দেখিয়াছে; কিন্তু বীভৎস হইয়া তার চোখে পড়িল আজ প্রথম··· আজ সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না—আজ যে-স্থানে তার মন যাইয়া পৌঁছিয়াছে সেস্থান পুষ্পরেণুর মত সূক্ষ্ম, মেঘের মত কোমল, কবরের মত নীরব, এবং সে নিভৃত—সে-নিভৃতি কিছুর মত নয়, তাহা তাদের অন্তরের নিজস্ব সৃষ্টি আর প্রাপ্তি।

হৃদয়নাথ দেখিল, মাঝখানে মাত্র হাত দশেকের ব্যবধান রাখিয়া দুইটি রমণী কলহ-তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছে—অন্যদিকে তাদের হুঁস্ নাই—থাকিলে, রমণীকুলের লজ্জানিবারণের একমাত্র উপায় ঐ পরিহিত বস্ত্রের অমন বিশৃঙ্খলা ঘটিত না।

উহাদের মুখ দিয়া কথা ছুটিতেছে···

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অশোকের আমলে একটা বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল; দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সেই বাঁধের দক্ষিণাংশে প্রবল স্রোতে জল আসিয়া বাঁধের পাথরে কেবলি ধাক্কা দিতেছে···কিন্তু এতদিন বাঁধ ভাঙ্গে নাই—আজ ভাঙ্গিয়াছে—সেই পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতপ্রমাণ অবরুদ্ধ জলরাশি আজ মুক্তি পাইয়া ছুটিতে সুরু করিয়াছে···

তেমনি বেগে ছুটিয়াছে উহাদের মুখের কথা···কিন্তু মুখের কথা মানে ভাগবৎ আবৃত্তি নয়, গালি—

তা' ছাড়া উভয়েই পরস্পরের উদ্দেশে লাথি-চালনা করিতেছে দেখা গেল—এত জোরে যে, হৃদয়নাথের মনে হইল, যে গজরাজকে জাহ্নবী-তরঙ্গ দুইটি ধাক্কায় টলাইতে পারে নাই, তৃতীয় ধাক্কায় টলাইয়াছিল, সেই গজরাজ উহাদের কাহারও একটা লাথিতেই ধরাশায়ী হইবে।···একজনের হাতে একখানা লম্বা কাঁচা কঞ্চিও রহিয়াছে; তাহার দ্বারা সে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতেছে না; ওদিক্ হইতে আক্রমণকে নিবারিত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া হৃদয়নাথের মনে হইল।

যেখানে অতি সুন্দর সূর্য্যমুখীর নির্ব্বিবাদে ফুটিয়া থাকিবার কথা সেখানে এই হৃদয়ভেদী ছেঁড়াছিঁড়ি চলিতেছে দেখিয়া হৃদয়নাথের হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল···

হৃদয়নাথ শুনিতে পাইল, উহারা পরস্পরের পিতৃ এবং মাতৃকুলের ইতিহাস কহিতেছে; পিতামহী, মাতামহী, মা, মাসী, খুড়ি, দিদি, জেঠাই প্রভৃতি গোত্রান্তর্গত এবং রক্তের দ্বারা সংযুক্ত ব্যক্তিগণের নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল এবং এখনও কিরূপ দেখা যাইতেছে সেই সব কথা···

মেয়ে দুটিকে হৃদয়নাথ স্বপ্নেও চেনে না, কিন্তু উহাদের একজন নীরবাসিনী, আর একজন—

সেই আর একজন হঠাৎ মুখ ফিরাইতেই হৃদয়নাথ দেখিল, সে সূর্য্যমুখী—সূর্য্যমুখী মুখ ফিরাইতেই হৃদয়নাথ তাহাকে চিনিল; কাঁচা কঞ্চিখানা হাতে করিয়া রহিয়াছে সূর্য্যমুখীই···

তবু হৃদয়নাথ তাহাকে চিনিতে পারিল; এবং, কি কারণে কে জানে, যখন একটি নিমিষের জন্য হৃদয়নাথ হৃদয়ের নিভৃতে বড়

যত্নে আশা করিতেছে যে, তাহাকে দেখিয়া সূর্য্যমুখী এখনই নিশ্চয়ই সম্বৃত-ভাব ধারণ করিবে, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই সুন্দরী সূর্য্যমুখী তাহাকে একেবারে নিরাশ করিয়া দিয়া অন্ধ রাগের মাথায় পরমশত্রু নীরবাসিনীকে তাহারই দিকে লেলাইয়া দিল··· চম্পক-অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল,—“ঐ যে বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা না নিয়ে ঘরে; আট্ গণ্ডা ভর্ত্তি হোক্”···

হৃদয়নাথের নিভৃতি-বিলাস ইঁটের ঘায়ে কাঁচের মত চূর্ণ হইয়া গেল···বুকে একটা ধড়ফড়ানি আর কানের ভিতর ঝিঁঝির ডাকের মত একটা একটানা প্রাণান্তকর শব্দ উঠিল···মুখে প্রায় নিঃশব্দে বলিল,—আশ্চর্য্য! বলিয়া চম্পট দিল।

তারপর, বহু রাত্রির সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল; সদর রাস্তায় বহু কাদা জমিল, শুকাইল, কিন্তু হৃদয়নাথ সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলা দিয়া আর হাঁটিল না।

অপহৃত আকাশ-কুসুম

উল্লাস চৌধুরীর বয়স এই একচল্লিশ।

বিরোধ বাধাইতে কেহ অগ্রসর না হইলে নিজে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়া বিরোধ বাধায় না—ইহাই উল্লাসের স্বভাব; এবং তাহার এই নির্ব্বিরোধ স্বভাবটির সঙ্গে তার চেহারা বেশ খাপ খাইয়াছে—দেহটা সমগ্রভাবে দেখিতে খুবই বৃহৎ আর প্রচণ্ড মনে হয়, যেন কঠিন পর্ব্বত একটি; কিন্তু চক্ষু দু'টি অহরহই এমন কৌতুকচঞ্চল যে, কেবল তাহার মোটা হাড় আর দেহের দৈর্ঘ্য দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, রাগের মাথায়ও উল্লাস দুর্ব্বার হইয়া উঠিতে পারে না। উল্লাসের দেহের আকৃতির আর মনের প্রকৃতির কার্য্যকরী বলের এই অসমতা যেন আনন্দই দেয়। চুলগুলি তার কোঁকড়াও নয়, সম্পূর্ণ খাড়াও নয়—প্রথম যৌবনে শিক্‌ গরম করিয়া চুলগুলিকে কুঞ্চিত করিতে বারকতক সে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ ব্যাপারে তার ধৈর্য্য দেখিয়া তাহার বিশেষ বন্ধু শৈলধর অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে-কুঞ্চন স্থায়ী হয় না দেখিয়া সে-শিক্‌ই সে ফেলিয়া দিয়াছে। উল্লাসের গায়ের রং ফর্সা বলা যায় না, তবে ষোল-আনা কালোও সে নয়।

সে যাহাই হউক, উল্লাসের বয়স এই একচল্লিশ চলিতেছে—

আদি যার স্মরণে নাই এমনই চল্লিশটি বৎসর পার হইবার পরও আরও একটি বৎসর যায় যায়। গণিতে প্রায় অসংখ্য ঐ চল্লিশটি বৎসর উল্লাস চৌধুরী ছাড়া অন্যত্র কোথাও দুরপনেয় চিহ্ন রাখিয়া, আবার উল্লাস চৌধুরী ছাড়া অন্যত্র কোথাও দুরপনেয় চিহ্ন বলিয়া যাহাকে মনে করা হইত তাহাকে নির্ম্মম লেহনে একেবারে চিহ্নহীন করিয়া মাথার উপর দিয়া আর গা ঘেষিয়া যেন উড়িয়া গেছে—উল্লাসের গায়ে তাহার পাখার বাতাস কি নখের দাগ যেন লাগেই নাই। উল্লাস চৌধুরীর একবারও মনে হয় না যে, তাহার বয়স চল্লিশোর্দ্ধ—একচল্লিশ; সে-কথাটা তার দৈবাৎ মনে হয় না, ঘা খাইয়া মনে হয় না, অনুভব করিয়া মনে হয় না, অর্থাৎ উল্লাস চির-যুবক। তার চোখে চাল্‌শে লাগে নাই, অথবা লাগিয়াছে কিনা ধরা পড়ে নাই। মাঝে মাঝে তাহাকে ভুরু দু'টিকে জড়ো করিয়া তাকাইতে হয় বটে, কিন্তু সেটা উল্লাস চৌধুরীর দৃষ্টির দোষ, কি যে-বস্তুকে সে দেখিতেছে তাহারই অনৌজ্জ্বলতা বা ক্ষুদ্রতা তাহার কারণ, কি আলোর অপ্রাচুর্য্যই তার অস্পষ্ট দেখিবার হেতু তাহা সে জানে না।

যাহাদের বয়স দৈবক্রমে একচল্লিশেরও বেশী, যথা, সাতচল্লিশ, কি বায়ান্ন, কি তেষট্টি, তাহাদের কাছে উল্লাস চৌধুরী সগর্ব্বে বলে বটেঃ "আর ত' বুড়' হ'লাম আমরা!"···বলে বটে, কিন্তু নিঃশ্বাসের ছায়াও তার নাক দিয়া বাহির হয় না; বৃদ্ধ হইবার কাতরোক্তি তাহা মোটেই নয়। যৌবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিসাবে যাহাদের পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ যাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া দূরে থাকিতে হইয়াছে, তাহাদের দলভুক্ত হইবার আবেদন সেটা

—কিঞ্চিৎ আস্কারা পাইবার চেষ্টা ; যেন বয়সটা অতি প্রাচীন একচল্লিশে পৌঁছিয়া উহাদের সবাইকার সঙ্গে তাহাকে কেবল পংক্তিবদ্ধ নয়, একাকার করিয়া দিতে বাধ্য। বয়সের নৈকট্যের ভাণ করিয়া বৃদ্ধদের সঙ্গে কৌতুকে অগ্রসর হইবার সুবিধা খোঁজা—আর কিছু নয়। কথাটা বলিয়া উল্লাস সকৌতুকে হাসে।

বয়সে যারা ছোট তাহাদের কাছেও উল্লাস চৌধুরী নিজের একচল্লিশের দম্ভ করে—যেন, দেখিয়া-শুনিয়া দুনিয়া সম্বন্ধে তার পরিপক্কতার অন্ত নাই, নাবালকদের সে-ও একজন অভিজ্ঞ মুরুব্বি।

এক কথায়, বয়স যে একচল্লিশ, অর্থাৎ জোয়ার বহিয়া যাইয়া ভাটার সুরু হওয়ার পরও যে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া স্রোত নিস্তেজ আর অবনমিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, উল্লাস চৌধুরী তিলমাত্রও এবং ক্ষণমাত্রও আজ পর্য্যন্ত তাহা অনুভব করে নাই।

উল্লাস চৌধুরী সবই কিছু কিছু জানে—

ওস্তাদের সাকরেদী করিয়া লাঠি খেলা শিখিতে গিয়াছিল ; ওস্তাদের বিদ্যাদান-দক্ষতায় ঘাত-প্রতিঘাতের সমস্ত কায়দা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও প্রয়োগ-কৌশল তেমন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ওস্তাদজীর বুক বরাবর মাথা নামাইয়া নমস্কার করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল।...গান-বাজনা শিখিতেও একদা সে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল ; ইচ্ছা ছিল, পরম বিদ্যার ষোল-আনাই শিখিয়া ফেলিবে ; কিন্তু গুরুর দাতব্যের মধ্যে গানের দুটি রাগিণী

এবং বাজনার তিনটি তালের বোল কেবল কণ্ঠস্থ হওয়া ছাড়া ব্যুৎপত্তির দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই—

গুরুকে এক ভরি গাঁজা প্রণামী দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সর্ব্বাগ্রে সাধারণ কেতাবী বিদ্যাই সে নিশ্চয়ই শিখিতে গিয়াছিল; কিন্তু তার তখনকার চুল যেমন কোঁকড়া হয় নাই তেম্‌নি লেখাপড়াতেও সে চেষ্টা ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে নাই; উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষায় ফেল করিয়া হেড্‌ পণ্ডিতের পায়ের ধূলা লইয়া দিন সাতেকের জন্য হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল।

তবু উল্লাস চৌধুরী আছে ভাল; গৃহস্থ হিসাবে সে এখন বেশ গতিশীল; জমিদারী সেরেস্তায় সে কাজ করে—মাসে দশ টাকা বেতন পায়; উপ্‌রি পাওনা আছে; কিছু জমি আছে—উৎপন্ন ধান্য প্রভৃতি যাহা পায় তাহা তাহার বৎসরের গড়ে সাত মাসের খোরাক।

এ-সব ছাড়াও আরো সৌভাগ্যের বিষয় ইহাই যে, উল্লাস চৌধুরী তের বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিল একটি নয় বৎসর বয়সের মেয়েকে। ক্রমপরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার এখন দু'টি কন্যা এবং তিনটি পুত্র…

কিন্তু বলিতে যতক্ষণ, আর অতীত হইবার পর ফিরাইয়া অনুভব করিতে গেলে যতক্ষণে মনে হয় ততক্ষণে, অর্থাৎ অত অল্প সময়ে, তার যৌবন অতীত ব্যাপারে দাঁড়াইয়া যায় নাই।

নয় বৎসর বয়সের বালিকা মানিনী নবম বৎসর যথা সত্বর পার হইয়া দশে পড়িল; এবং তারপর সে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি

বৎসরই ঢেউয়ের মত গায়ের উপর দিয়া পার করিয়া দিল···এবং একদিন দেখা গেল, যৌবনের শ্রীমাধুর্য্য গৌরব আর পরমৈশ্বর্য্যের পূর্ণাধিকারিণীরূপে সে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে—বলা বাহুল্য, উল্লাসের চোখের সাম্‌নে। স্ত্রীর ঐ অভাবনীয় শারীর সমৃদ্ধি, অর্থাৎ অধিপতি উল্লাসের নিজেরই ঐ চমক্‌প্রদ সম্পদ, উল্লাসের চোখে পড়িল না এমন নহে। গ্রাম্য ক্ষুদ্র একটি লোক হইলেও এবং অতীব নগণ্য উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষাতেই ফেল-করা ব্যক্তি হইলেও উল্লাস লক্ষ্য করিত, প্রেয়সী মানিনী সুন্দরী এবং সমাগত-যৌবনা···

তার নিমীলিত পল্লবাচ্ছাদিত চক্ষু দু'টি সুন্দর—উন্মীলিত চক্ষু দু'টিও সুন্দর; চোখের তারা দু'টি আবার চঞ্চল, যেন দুষ্টু; এমন অশেষ চঞ্চল যে, আর চাঞ্চল্যের এমনিই ভঙ্গী, ক্রীড়ায় ব্রীড়ায় তাহাতে এমনি সংমিশ্রণ যে, আর তাদের এমনি উৎফুল্লতা যে দিশেহারা করিয়া দেয়···তাহার সমস্ত দেহখানার দিকে, পা হইতে সুরু করিয়া মাথা পর্য্যন্ত যে সুডৌল সমগ্রতা বিরাজ করিতেছে তাহার দিকে, দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেরই মনে মুহুর্মুহুঃ এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়, আর মনে এমন মধুর সখ্যরসের নির্ঝর ছুটিতে থাকে যে, উনিশ বছরের উল্লাস চৌধুরী অবাক্‌ হইয়া ভাবে, কেন এমন হয়! উহার দেহের ধারণাতীত সেই বস্তুটা কি যাহা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া চুমুক দিয়া পান করি—আর যাহার গুণে সারা মন আচ্ছন্ন আর সারাদেহ শিহরিত করিয়া এমন মাদকতার সৃষ্টি হয়···মনে হয়, আমি মরিব না, ও মরিবে না··· আরো মনে হয়, বহুৎ ভাগ্যের জোর আমার।

কেন এমন ঘটে, সে-রহস্যটা কি, তাহা উল্লাসের বিশেষ বন্ধু শৈলধর স্থূল কথায় মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দেয়···

শৈলধরও বলে, তোর বরাতের জোর খুব।

উল্লাস মানিনীর পাশে বসিয়া পড়িয়াই মুখখানা তার মুখের দিকে আগাইয়া দেয়—মানিনীর নিঃশ্বাস আর দেহসুরভির পরিধির ভিতর···তখন উল্লাসের হাড়ের ভিতর যে রস চলাচল করে সেই মর্ম্মরস-প্রবাহই যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া সম্প্রসারিত হইতে থাকে···তীরের ফলকের মত অতি তীক্ষ্ণ একটা ঋজুতা লাভ করিয়া যেন তাহার প্রাণসত্তার উপরিভাগে উঠিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে···

বলে,—একটা চুমু।

মানিনী তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বলে,—না।

—না, দাও।

উল্লাসের মনে হয়, আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনটি না পাইলে সে বাঁচিবে না।

মানিনী তখন যেন নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই তার অনুরোধ রক্ষা করে—আল্‌গোছে স্বল্পক্ষণস্থায়ী একটি চুম্বন দেয়।

উল্লাসের পাওয়ার ইচ্ছার আগুন তাহাতে প্রশমিত হয় না—

বলে,—এইটুকু নাকি ?

মানিনী ভ্রূভঙ্গী করে, যেন জানাইতে চায় সে বিরক্ত হইয়াছে ; তারপরই ফিক্ করিয়া একটু হাসে ; বলে,—আচ্ছা

তুমি! বলিয়াই অকস্মাৎ দু'হাত তুলিয়া তাহার গ্রীবালিঙ্গন করিয়া তাহাকে যেন সর্ব্বতনু দিয়া গ্রাস করিয়া ধরে—অধরে অধর মিলায়, অতল-গভীর আর সুদৃঢ় আর অমৃত আর আত্মহারা একটি চুম্বন দেয়—

উল্লাসের প্রাণের অগ্নিসমুদ্র যেন শুষিয়া লয়—

গুরুভার আনন্দের একটি নিঃশ্বাস মোচন করিয়া উল্লাস বলে,—এতক্ষণে বাঁচ্‌লাম। কত কষ্ট হচ্ছিল তা বল্‌তে পারিনে।

মানিনী বলে,—পালাও এখন। আর নয়।

মানিনী ঘুমাইয়া থাকিলে উল্লাস তার একখানা হাত অতি সন্তর্পণে তুলিয়া লয়—আনত দৃষ্টি তদ্গত নিবদ্ধ করিয়া তাহার করতল নিরীক্ষণ করে···উল্লাসের সারাপ্রাণ গলিয়া সেখানে ঢালিয়া পড়ে···আত্মসমর্পণের কিছু আর বাকি থাকে না—

করতলের রেখাবিন্যাসই কি সুন্দর! স্থূল সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম; দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ; আর, হ্রস্ব এবং হ্রস্বতর রেখাগুলি অদৃষ্টে যা' লেখা আছে তাহারই দুর্ব্বোধ্য অক্ষরমালা—পড়িবার যো নাই; ভাবিয়া উল্লাস বিস্মিত হয়—

কতকগুলি রেখা, গাছের পল্লবহীন সরু প্রশাখাশ্রেণীর মত একই বিন্দু হইতে চলিতে সরু করিয়া খানিক সতেজে অগ্রসর হইয়াই মিলাইয়া গেছে···আয়ুর রেখাটা তর্জ্জনীর মূল প্রায় স্পর্শ করিয়াছে—

মানিনী বহুদিন বাঁচিবে···

পরস্পরের এই উষ্ণ নিটোল যৌবনসম্ভোগ ঠিক্ তেমনি দীর্ঘজীবী হইয়া উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে নৃত্যের ছন্দে প্রবাহিত হইয়া তার ভবিষ্যতের অনন্ত দিবস ও রাত্রিগুলি আনন্দের জ্যোৎস্নায় আর বিহসিত রৌদ্রালোকে প্লাবিত করিতে থাকে···

অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উল্লাস চৌধুরী মানিনীর হাতের আঙুলগুলি একটি একটি করিয়া মুড়িয়া দেয়; তারপর দু'টি করতলের ঈষৎ স্পর্শের অভ্যন্তরে মানিনীর চমৎকার ক্ষুদ্র মুষ্টিটাকে আবদ্ধ করে···

উল্লাসের মনে হয়, সোনার একটি পাখী—

গল্প শুনিয়া ছেলেবেলায় যাহাকে দেখিতে আর পাইতে ইচ্ছা হইত; আর, এখনও যেন ভাবিতে ভাল লাগে, সে পাখী আছে —তাহাকেই যেন সে দুই হাতের বেষ্টনের ভিতর ধরিয়া রাখিয়াছে ···স্পর্শ যাহা অনুভূত হইতেছে তাহা সেই অকাতর আর অতিশয় লোভের বস্তু পোষ-মানা আর প্রেমতরলিত সোনার পাখীটির সুকোমল হৃদয়ের···

মানিনীর বন্দী হাতখানা অকারণেই একটুখানি কাঁপে। বন্দী কি মুক্তি চায়? উল্লাস মনে মনে একটু হাসিয়া আর একটু চাপ দেয়—হাতের অনতিলঘু বন্ধন ধীরে ধীরে উন্মোচিত করিয়া লইয়া উল্লাস দেখে, মানিনীর হাতের ত্বকের চম্পকবর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে···

উল্লাস মানিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজের মাথার একটা চুল ছিঁড়িয়া লয়; সেই চুল বুলাইয়া মানিনীর নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দেয়—

মানিনী ঘুমের মধ্যেই কপাল কুঁচাইয়া বলে,—উঃ। বলিয়া ঘুমের মধ্যেই নাকের উপর হাত বুলাইয়া লয়···

উল্লাস আবার সুড়সুড়ি দেয়···তারপর আবার—

এইবার মানিনীর ঘুম ভাঙিয়া যায়, চোখ খানিকটা মেলে—

উল্লাস বলে,—বেজায় মাছির উৎপাত। নাকে মুখে বস্‌ছে। আমি তাড়াচ্ছিলাম। বলিয়া হাসে।

লাল চোখের উপর ক্লান্তভাবে একবার পলকপাত করিয়া লইয়া মানিনী আলস্যভরে বলে,—হ্যাঁ, তুমি তাড়াচ্ছিলে! তুমিই সুড়সুড়ি দিচ্ছিলে।

মানিনীর এই অবশ আলস্য-শিথিল নিদ্রাজড়তা উল্লাসের বড় ভাল লাগে; হাতের চুলগাছা দেখাইয়া বলে,—দিচ্ছিলামই ত'। কি করবে আমার? বলিয়া মানিনীকে আলিঙ্গন করে; আর ভাবে, খুবই অদৃষ্টের জোর আমার।

বরাতের বড়াই করিতে করিতে একটি কন্যা জন্মিয়া গেল। স্বজনবর্গ কি আশা করিয়াছিল, এবং তাহারা কেহ ক্ষুণ্ণ হইল কিনা সে-কথা অবান্তর; কিন্তু উল্লাস চৌধুরী কিছুমাত্র দমিল না; মানিনীও বিশেষ বিচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না; বরং উহাদের বিলাসানন্দ, প্রথম ফুলটি দেখিয়া ফুল-বাগানের মালীর সুখের মত, যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। গাছের আরো জল চাই।

এই উল্লাস চৌধুরীর বয়স এখন, আটত্রিশ নয়, ঊনচল্লিশ নয়, একেবারে একচল্লিশ—সর্ব্বনেশে একচল্লিশ।

বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের তুমুল হল্লা; কিন্তু উল্লাসের তাতে ধ্যান ভাঙে নাই।

উল্লাসের যে মেয়ের কথা উপরে বলিলাম, মনের মত ঘরে বরে তার বিবাহ হইয়া গেছে অনেকদিন হইল; দয়াময়ের ইচ্ছায় একটি পুত্রও তার জন্মিয়াছে; এবং সেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ী হইতে আজ সেই পরম সুখকর সুসংবাদটা আসিয়াছে—

অর্থাৎ উল্লাসের দৌহিত্র হইয়াছে; কিন্তু মানিনী আর উল্লাস চৌধুরীকে দেখিয়া মনে করিবার যো নাই যে, উহাদের দৌহিত্র হইয়াছে। দৌহিত্র পাইতে হইলে অবশ্য নিশ্চেষ্ট বানপ্রস্থের উপযোগী হইয়া এমনভাবে পাকিয়া উঠিবার দরকার নাই যে, এখন খুলিয়া পড়িলেই আরাম—দৌহিত্র পাইতে মাত্র একচল্লিশ আর সাঁইত্রিশই যথেষ্ট; তবে শুনিতে নাতি, এই যা' বাধা।

মানিনী বলিল,—যেতে বলেছে বেয়াই বেয়ান্। একবার দেখে' এস গিয়ে।

উল্লাস বলিল,—নিশ্চয় যাব। কালই যাব—ভোর বেলা রওনা হব। বেলা ন'টা নাগাদ পৌঁছে যাব। কিন্তু একটু সোনা চাই যে!

দু'জনেই থম্‌কিয়া গেল।

উল্লাস আর মানিনীর ঘরে খাবার, মনে সুখ এবং আর যা-ই থাক্, সোনা নাই।

স্বর্ণসমস্যার সমাধান করিতে ডাক পড়িল বিশেষ বন্ধু শৈলধরকে। শৈলধর উল্লাসের এম্‌নি অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, কেবল তাহার সঙ্গেই আর্থিক সঙ্কটচর্চ্চা প্রকাশ্যে এবং পরনারীচর্চ্চা

গোপনে চলিয়া থাকে। শৈলধর বুদ্ধিমান—সহরের সুসভ্য আদবকায়দায় তাহাকে পটু করিয়া তুলিতে শৈলধর কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিল—এবং সহরে যাইয়া উল্লাস একবার চরিতার্থ হইয়া আসিয়াছিল একমাত্র শৈলধরেরই আনুকূল্যে, নেতৃত্বে এবং মধ্যবর্ত্তিতায়; এবং শৈলধর আরও মূল্যবান উপকার করিয়াছিল ইহাই যে, সে-ই সাহস দিয়া দিয়া তার হৃদ্‌কম্প দূর করিয়াছিল। উল্লাস শৈলধরের নিকট কৃতজ্ঞ।

সে যাহাই হউক, ডাক পাইয়া শৈলধর আসিল এবং বুঝাইয়া বলিল যে, দুঃখের কোনোই কারণ ঘটে না যদি দৈবাৎ সোনা না থাকে; কারণ, রৌপ্যও মহার্ঘ্য বস্তু, তুল্য উজ্জ্বল, উপরন্তু রৌপ্যমুদ্রার বিশেষ খাতির এইজন্য যে, নগদ লেনদেনের ব্যাপারে তাহা অধিকতর চল্‌তি। সুতরাং দু'টি টাকা দিয়া দৌহিত্রের মুখ দেখিলে কিছুই নিন্দার কাজ হইবে না। দৌহিত্র এখনও আঁতুড়ে অবস্থান করিতেছে; সোনা রূপার পার্থক্য সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই। দৌহিত্রের জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গ জানে যে, সোনা রূপায় শনি লক্ষ্মীর বিবাদ কিছু নাই।

বুদ্ধির কথা শুনিয়া উল্লাসের দুঃখ ঘুচিল।

ঠিক্ হইয়া রহিল, খুব ভোরে উঠিয়া, একটু রাত্রি থাকিতেই, উল্লাস যাত্রা করিবে। আট মাইল কতটুকুই বা! রৌদ্রের তেজ বাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বেয়াইয়ের বাড়ীতে পৌছান' যাইবে।

শৈলধরও সেই পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেল।

মানিনী বলিল,—টাকা দুটো দিয়ে ছেলের মুখ দেখ'।

—উঁ-হুঁ। টাকা দুটো নিয়ে আমি সট্‌কাব। কেউ খুঁজে

পাবে না চোদ্দ বছর। বলিয়া 'চোদ্দ বছর' কতটা দীর্ঘ, এবং কত ভয়ঙ্কর, এবং বিরহ যে কত বিষময়, চোখ বড় করিয়া উল্লাস তাহার একটু আন্দাজ দিল; এবং তারপর সান্ত্বনা দিতে হাত তুলিয়া মানিনীর চিবুক স্পর্শ করিতে যাইয়া সে দেখিল, মানিনী পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে।

খুব ভোরে, রাত্রি একটু থাকিতেই, উল্লাস চৌধুরী টাকা দু'টি লইয়া এবং জুতা জামা পরিয়া দৌহিত্র দর্শনে যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া উঠিল···

মানিনী বলিল,—কেমন হয়েছে ভাল করে' দেখে' এস, মায়ের মত না বাপের মত। আমার হ'য়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কোরো।

উল্লাস বলিল,—পায়ের ধূলো দাও খানিক্ তার জন্যে, নিয়ে যাই।

মানিনী বলিল,—মালতীর দেওরদের কিছু মিষ্টি কিনে' দিও। বলিয়া নিজের পুঁজির একটা টাকা উল্লাসের হাতে দিল।

উল্লাস বলিল,—বাবা, বেজায় টাকার মানুষ!···তা' দেব। বলিয়া উল্লাস হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

মানিনী বলিল,—আজই ফিরো কিন্তু।

—আচ্ছা।

উল্লাসদের গ্রাম বল্লভবাজারের পরেই আর একটা গ্রাম, সোনারপুর; সোনারপুর পার হইয়াই মাঠ প্রায় ছয় মাইল—

সেই মাঠের পরেই যে গ্রাম সেই গ্রামের নাম মধুনগর ; মধুনগরে উল্লাসের মেয়ে মালতীর শ্বশুরবাড়ী।

উল্লাস স্ফূর্ত্তির সঙ্গে রওনা হইয়া গেল...

গ্রামদ্বয় পশ্চাতে ফেলিয়া উল্লাস যখন মাঠে পড়িল তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ফাল্গুন-শেষের মাঠের চেহারা তেমন সুশ্রী নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রই গুমুরায় কণ্টকিত হইয়া আছে ; তথাপি নবীন সূর্য্যকে প্রান্তে ধরিয়া রহিয়াছে বলিয়াই সমুদায় মাঠের রুক্ষতা একটা নির্দ্দেশহীনতায় অন্তর্হিত হইয়াছে—অরুণালোকের হাস্যময়তায় ক্ষেত্রের নিঃস্বতা যেন একটা মনোরম প্রচ্ছদে মণ্ডিত হইয়াছে।

আ'লে আ'লে পথ—

সুবিস্তীর্ণ শূন্য মাঠের মাঝে হঠাৎ একটা স্থানে তিল বপন করা হইয়াছে ; চারাগুলি যেমন মসৃণ, তেমনি সতেজ—বহুব্যাপী রিক্ত ধূসরতার মাঝে এই ক্ষেত্রটুকুর হরিদ্বর্ণ যেন ভূমিলক্ষ্মীর আয়তির চিহ্ন—বল্লভ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে অনর্গল আনন্দ নিবেদন করিতেছে...

চলিতে চলিতে থামিয়া উল্লাস, স্বভাবের শোভা নয়, চারাগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিল—তাহাদের ভবিষ্যৎ একটু বিবেচনা করিল।

ঐ দূরে মরাদীঘি—দীঘির নাম এখন মরাদীঘি। এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড কবে কোন্ ভূস্বামীর একাধিকারে ছিল—তিনি সখ করিয়া এবং নিজের অবসর বিনোদনার্থ ঐ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন—উহার জল, যতই উৎকৃষ্ট হউক, বহন

করিয়া কেহ গৃহে লইত না, দূরত্ববশতঃ লওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই। জমিদার এই দীঘির ধারে হাওয়া খাইতে আসিতেন, দীঘির জলে মাছ ধরিতে আসিতেন। জলকরের চতুর্দ্দিকে দামী দামী বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল—গাছগুলি আছে; এই ফাল্গুনের শেষে তাহাদের শুক্‌ন' পাতায় তীরের মাটি আচ্ছন্ন হইয়া গেছে…আর, নবপল্লবের উদ্গম-উল্লাসে তা'রা যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে—পল্লবদলের বিকিরিত আভা এমনই সঞ্চারণশীল যে, সেই আভার প্রতিবিম্বিত শ্যামলতায় নিম্নের তৃণহীন ক্ষেত্র-মৃত্তিকাও যেন স্নিগ্ধ সরস হইয়া গেছে।

কিন্তু দীর্ঘিকায় জল নাই; ফোয়ারার মুখ বন্ধ হইয়া গেছে অনেকদিন আগেই; তারপর খাতের ভিতর পলি পড়িয়া পড়িয়া গর্ত্ত বুজিয়া গেছে।

জমিদারের বাড়ী হইতে এই দীর্ঘিকা পর্য্যন্ত একটি খানিক-পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছিল—রাস্তাটার কঙ্কাল নয়, যেন ছেঁড়া ছেঁড়া চাম্‌ড়া স্থানে স্থানে আজও দেখিতে পাওয়া যায়, আর-সবটাই লাঙ্গলের গ্রাসে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

এই বাগানের পাশ দিয়া ঘুরিয়া যাইয়া উল্লাসকে তদানীন্তন সেই রাস্তা বরাবর উঠিতে হইবে—সেখান হইতে মধুনগর নাক-সোজা।

আ'ল ছাড়িয়া উল্লাস চৌধুরী কুহুরব শুনিতে শুনিতে দীঘির পাড়ের ধারে ধারে চলিতে লাগিল…এবং মোড় ঘুরিয়াই যাহাকে সে দেখিতে পাইল সে একটি রমণী—সে-ও পথিক; হাত তিনেকের ব্যবধানে দু'জনাই দাঁড়াইয়া পড়িল, ভয় পাইয়া নয়,

হঠাৎ সাম্‌নে মানুষ দেখিয়া…রমণীর সঙ্গে একটি ছয়-সাত বৎসরের বালক।

উল্লাস স্বচ্ছন্দে সেই রমণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিল; মনে হইল, রমণী সুন্দরী—তারপরই উল্লাস পাশ কাটাইয়া চলিতে সুরু করিল—

এবং হাত পাঁচেক সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াই পিছনের টানে যেন তার অতীত দিনের ভিতর মূর্চ্ছিত সংজ্ঞা হঠাৎ ধড়্‌ফড়াইয়া জাগিয়া উঠিল…পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তার মনে হইল, এ কি ব্যাপার! এমন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী এক রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মুখখানা স্পষ্ট চোখে পড়িল; কিন্তু চোখে পড়িয়াও সে অন্তরে প্রবেশ করিল না কেন! কেন মনে পড়িল না, রমণী চিরকালই রমণী!

উল্লাস চৌধুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; নিজের কাছেই সে জানিতে চাহিল, তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি?

সমাপ্তির পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ

পাথরখণ্ডীর ভগীরথ দত্ত পৌষমাসে ছাপ্পান্ন বৎসরে পদার্পণ করিলেন এবং মাঘ মাসেই তাঁর একটি দাঁত পড়িয়া গেল—পড়িল উপর-পাটির সামনেরই বড় ছুটি দাঁতের একটি, দক্ষিণ দিকেরটা। ভগীরথ এখন ডাঁসা পেয়ারা খান্ না—মাংসাশীও তিনি নন্; তবু তিনি দুঃখিত হইলেন। মাথার দশভাগ চুল আগেই পাকিয়াছিল; কলপ লাগাইয়া তিনি তাহা তরতাজা রাখিতেন। এবার মাঘে দাঁত পড়িল। সম্মুখের চুল ঈষৎ পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে—সেটিও বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গন, তবে মর্ম্মান্তিক নয়…কিন্তু দাঁতের শূন্য স্থান যদি পুনঃপুনঃ পূর্ণ করিতে হয় তবে মেরামতের সরঞ্জাম লইয়া বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গনের পশ্চাতে সে দৌড়ের শেষ যে কোনোদিনই আসিবে না!…যার সাম্‌নের চুল পাত্‌লা সেই যে অশক্ত এরূপ সন্দেহ কেহ করে না; কিন্তু যার দাঁত পড়িয়াছে, শক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আর তার তার স্থান নাই—পরাজিত ও পশ্চাতে পরিত্যক্তের লাঞ্ছনা সর্ব্বসমক্ষে তার ললাটে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা পড়িয়া গেছে…

অনেক দিন হইতেই ভগীরথ দাঁতের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু সে কেবল নিজস্ব অনুভূতিই—সে দৌর্ব্বল্য লোকের চোখে ধরা পড়ে নাই। যাহা আপনিই লোকের চোখে

পড়ে না তাহাকে ঢাকিবার জন্য আয়োজনের দরকার নাই ; কিন্তু লোকের চোখে যাহা পড়িবেই তাহা ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু হইয়াও যদি ঢাকিয়া রাখিবার উপায় না থাকে তবে সে বড় বিপদ। ভগীরথ মাঘ মাসে এই বিপদে পড়িলেন।···বার্দ্ধক্যের পীড়নে শক্তির নিদর্শন, দেহের অংশ খসিয়া পড়িতেছে—এ বড় ভয়ঙ্কর।

দাঁতগুলি ভগীরথের গর্ব্বের সামগ্রী ছিল—যৌবনে তাঁর স্ত্রী শঙ্করী তাঁর দাঁতের প্রশংসা করিতেন ; এবং এখনও ভগীরথের বিশ্বাস, যৌবনের প্রিয়া প্রিয়ের অধর স্পর্শ করিতেন কেবল সুসজ্জিত দাঁতের শোভায় মুগ্ধ হইয়া।···শঙ্করী সে বিষয়ে এখন নীরব হইয়া গেছেন—এমন কি, তাঁহাকে নির্লিপ্তই মনে হয়··· তবু ভগীরথের প্রাণে যৌবনের 'জলতরঙ্গ' এখনও মাঝে মাঝে বাজিয়া বাজিয়া ওঠে।

যাহা হউক, ভগীরথের দাঁত একটি পড়িল···দাঁতটি খসিয়া আসিল প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময়—

ভগীরথ সেটিকে হাতের পাতার উপর রাখিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক খানিক্ নিরীক্ষণ করিলেন··· ভিতরের দিক্‌টা ঠিক্ কালো নয়—লাল রং গাঢ় হইয়া আসিতে আসিতে কালো হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে দেখিতে যেমন হয় অর্থাৎ পাঁঠার মেটের যে রং দেখা যায়, সেই রঙের···উপরটা সাদা—অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ একটা রেখা রহিয়াছে—পাড়ের মত।···দাঁতের শিকড় ছিল কিনা দেখিতে যাইয়া ভগীরথ তেমন কিছু দেখিতে

পাইলেন না—সঙ্গে শিকড়ের আঁশ লইয়া দাঁত খসিয়া আসে নাই।

দাঁতটিকে ভগীরথ টান মারিয়া ফেলিয়া দিলেন না—যে সৌখীন যৌবনের আর পরিপাকপ্রিয় জীবনের পরমোপকারী সঙ্গী ছিল তাহাকে পরকালের প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়া দিলেন…

দাঁতটির এ-পিঠ্ ও-পিঠ্ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তিনি মাটি ছানিয়া একটি অনতিবৃহৎ ডেলা প্রস্তুত করিলেন…আঙ্গুল চালাইয়া তাহাতে একটি ছিদ্র করিলেন…দাঁতটিকে ডেলার ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইয়া ডেলাটা হাতের উপর নাচাইয়া নাচাইয়া তাহাকে নিরেট করিয়া তুলিলেন…

দাঁতটি একেবারে অকীটবিদ্ধ কর্ম্মক্ষম ছিল স্মরণ করিয়া তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল—

তারপর তিনি উঠিয়া যে-কাজে বসিয়া গেলেন তাহা আশ্চর্য্য…

মাটির ডেলাটী আনিয়া সযত্নে তুলসী-তলায় নামাইয়া রাখিলেন—

…এতক্ষণে শঙ্করীর দৃষ্টি তাঁহার, অর্থাৎ অকেজো লোকের, কাজের দিকে আকৃষ্ট হইল ; বলিলেন,—কি করছ ?

ভগীরথ কাটারির অগ্রভাগ দিয়া তুলসীতলার মাটি খুঁচাইতে-ছিলেন…মুখ তুলিয়া বিমর্ষমুখে বলিলেন,—একটা দাঁত পড়্‌ল …বলিয়া দাঁত দেখাইলেন, যেটা পড়িয়াছিল সেটা নয়, মুখের গুলি।

শঙ্করী দেখিলেন, শূন্য স্থানটা নূতন বটে!

গর্ত্তের মাটি কুরিয়া কুরিয়া তুলিতে তুলিতে ভগীরথ বলিলেন,—আমার অস্থি রইল, মানে রাখ্‌লাম, এই তুল্‌সীতলায়···নিজেই যেয়ে গঙ্গার জলে ফেলে' দেব একসময়।···আপনার লোক বল্‌তে ত' সেই জামাই দু'টো, আর ভাগনেরা···তারা ত' যমের মতই আপন···অস্থি নিয়ে গঙ্গায় দিতে তাদের বয়ে গেছে।···খবর পেয়ে তখন তোমায় যদি দেখ্‌তে আসে তা-ই ভাগ্যি মেন'।··· তুমিও—

কিন্তু শঙ্করী বহুপূর্ব্বেই নিজের কাজে গেছেন—

মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ভগীরথ নিঃশব্দে গর্ত্তখনন সমাপ্ত করিয়া অস্থিসহ মৃত্তিকা-পিণ্ডকে তুল্‌সীতলায় সমাধিস্থ করিলেন।

যেখানে দাঁতটা ছিল, ভগীরথের অজ্ঞাতেই তাঁর বিরহী জিহ্বা সেখানে বিচরণ করিতে আসে—যে আর নাই, বৃথা জানিয়াও তাহাকেই যেন খুঁজিয়া বেড়ায়···

যে কথায় আপত্তি আছে কাহারো সেই কথায় দাঁতে কিরে কাটা ভগীরথের পুরাতন অভ্যাস···আগে সুসম্পূর্ণ দংশন ভালই দেখাইত—আপত্তিও জোরাল হইত; কিন্তু অন্তঃপুরে বসিয়া ইতিমধ্যেই দেখা গেছে দংশন এখন সম্পূর্ণ বসে না—আপত্তির জোর কমিয়া যায়; আর, দুই পাশে চাপ পাইয়া ভূতপূর্ব্ব দাঁতের শূন্য স্থানে জিহ্বা স্ফীত হইয়া ওঠে···

দাঁতের দুঃখে ভগীরথ ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন···অজীর্ণ রোগ কবে দেখা দেয় যেন!

ধ্বংসদেবতা নামে যতই ভীষণ হউন, তাঁর হাতে থাকে কেবল একটি তুলিকা, আর একটি সাঁড়াশী। তিনি যদি উপযুক্ত পাত্রের উপর তাহা কাজে লাগান্ তবে সেই কারণে সেই পাত্রের মানুষের উপর ক্রোধের কারণ কি থাকিতে পারে!

ভগীরথের অবশ্য মনে হয় নাই যে, দাঁত পড়িয়াছে বলিয়া রাগের কারণ ঘটিয়াছে···তবু তিনি রাগিয়া উঠিলেন।

ভগীরথের বন্ধু সদাশিব প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন —হাতে নিজের হাতে প্রস্তুত বাঘ-মুখো বাঁশের লাঠি রহিয়াছে··· বাঘের মুখের উপর কাচের চোখ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে···

আদরের লাঠিখানা হাতে করিয়া সদাশিব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।···ও-পাড়া সারিয়া এ-পাড়ায় পৌছিতেই সদাশিবের তামাকের তৃষ্ণা পাইল···ভাবিলেন, ভগীরথের কাছে একটু বসিয়া যাই···গভীরভাবে আলোচনার উপযুক্ত একটা ব্যাপারও সম্প্রতি গ্রামে ঘটিয়াছে।

সদাশিবের যাত্রা ভালই ছিল—অল্পেই ভগীরথের সাক্ষাৎ মিলিল—

ভগীরথ তাঁর বাড়ীর দুয়ারেই ছিলেন; বলিলেন,—এস।

সদাশিব ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; আলাপ জমাইতে বলিলেন,—জেলেপাড়ার কথাটা শুন্‌লে ত'?

ভগীরথ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—শুন্‌লাম পরম্পর।

—কি আস্পর্দ্ধা বেটার! বুকের পাটাটা দেখ একবার···!

সন্ধ্যেবেলা—চারিদিকে লোক ঘরে-বাইরে বেড়াচ্ছে···তখন কিনা! ···দেখ বেটার সাহস! বলিয়া সদাশিব সাহসের প্রতিবাদস্বরূপ লাঠি দিয়া খুঁচাইয়া খানিকটা মাটি তুলিয়া ফেলিলেন।

এই প্রসঙ্গের উপরেই সদাশিবের বসিবার এবং তামাকু সেবনের নিমন্ত্রণ পাইবার কথা···কিন্তু একটা বিঘ্ন ঘটিয়া গেল—

জেলেপাড়ার কোনো এক গৃহস্থের দুষ্মন ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে সন্ধ্যাবেলাতেই আসিয়াছিল, এবং ধরা পড়িয়া মার খাইয়া আধ-মরা হইয়াছিল···

সুতরাং গৃহস্থের সেই শত্রুর দুঃসাহসিকতার মধ্যে যে নির্ব্বুদ্ধিতা ছিল তাহাতেই ছিল ভগীরথের আপত্তি—

তিনি দাঁতে জিব্ কাটিলেন—

জিব্ আর দাঁত বাহির হইয়া পড়িল···

সদাশিব ভগীরথের মুখের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন; দেখিলেন, যেন শুভ্র যবনিকার গাত্রে ছিদ্র হইয়া ওপারের অসীম কৃষ্ণসাগর চোখে পড়িতেছে···চম্‌কাইবার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—দাঁত পড়েছে!···বলিয়া মুহূর্ত্তেক হা করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তা' হ'লে ত' এইবার···

বলিয়া সদাশিব থামিয়া আর হাসিয়া আর বন্ধুর মুখের সাম্‌নে হাত তুলিয়া তুড়ি বাজাইয়া দিলেন—ফট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন কেউ বাঁধন ছিঁড়িল···

ইঙ্গিতটা পরকালের দিকে নিশ্চয়ই—

মুখে কিছু না বলিয়াও সদাশিব এমন স্থানের দিকে অব্যর্থ

অঙ্গুলি তুলিয়াছেন যেখানে ভগীরথকে যাইতেই হইবে···যাওয়াই নিয়ম—ভগীরথ তা জানেন—

তথাপি তিনি রাগিয়া উঠিলেন—

বলিলেন,—দাঁত তোমার বাবার পড়ে নাই ? তোমার মায়ের পড়ে নাই ? তোমার পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীর পড়ে নাই ? তোমার পড়বে না ?

ক্রমাগত এই কয়টি ব্যক্তিসম্পর্কিত প্রশ্ন করিয়া ভগীরথ তারপর বলিলেন,—যাও, বিরক্ত করো না। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া অমঙ্গলের সঙ্গ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন।

এই অকারণ এবং আকস্মিক উগ্রতায় তামাকের তৃষ্ণা বিস্মৃত এবং অবাক্ হইয়া সদাশিব বিমুখ বন্ধুর পিঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন···তাঁর লাঠির মাথার বাঘের চোখ ছাড়া আর সবই যেন ম্লান হইয়া গেল।

হাস্যচ্ছলে মৃত্যুর আলোচনা ইতিপূর্ব্বে এত হইয়াছে যে, তাহার ইয়ত্তা নাই···সেদিন যে দ্রুতগতিতে আসিতেছে ইহা ক্লেশের বা শঙ্কার বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। "মরিলেই বাঁচি"—অভিমান এবং বীতস্পৃহামূলক এরূপ উক্তি ভগীরথের মুখে শোনা গেছে। মরিয়া এই যন্ত্রণাপ্রদ এবং অকৃতজ্ঞ সংসারের কবল হইতে তাঁর মুক্তিলাভের বাসনাটা যেমন কপট, সদাশিব 'এইবার' বলিয়া তুড়ি বাজাইয়া দিয়া অনতিদূরোপনীত কালের দিকে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও তেমনি কপটতায় পরিপূর্ণ—

বহুবার উক্ত বাক্যের সরস পুনরাবৃত্তিতে রাগের কারণ কি থাকিতে পারে ?

৯০

সদাশিব ভাবিলেন, বন্ধুর মন অন্য কারণে খারাপ আছে· তাঁহারও মন খারাপ হইয়া গেল।

সদাশিব চলিয়া গেলে ভগীরথ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইলেন··· উঠানের ঘাসের ভিতর দু'টি কাঁটানটের গাছ বড় হইয়া উঠিয়াছিল —তাহা উপড়াইয়া ছিটে কঞ্চির বেড়া পার করিয়া ফেলিয়া দিলেন···তারপরে ভৃত্য রাখালকে সম্মুখে পাইয়া গরুগুলি কেন রোগা হইয়া যাইতেছে জানিতে চাহিয়া তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিলেন···

তারপর কার কাছে কি খুচ্‌রা পাওনা আছে মনে করিতে যাইয়া ভগীরথ দেখিলেন, খুচ্‌রা পাওনা যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাহা সকালবেলায় আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই···

তারপর তাঁর মনে পড়িল, ঋষি জোয়াদ্দারের দরুণ ক্ষেতটাতে চাষ দিয়া মুগ বপনের কথা ছিল···কাজটা কতদুর অগ্রসর হইয়াছে একবার তদারক করিয়া আসিলে হয়···ভাগের জমিতে চাষ দিতে লোকের অবহেলা যেন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে!

সুতরাং ভগীরথ ঋষি জোয়াদ্দারের দরুণ সেই ক্ষেতখানা যে মাঠে আছে সেই মাঠের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন···

কিন্তু পথে তাঁহাকে অপরে ডাকিয়া লইল···

জিব দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্যান্য দাঁতের গোড়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন—জিব্‌ স্থিতিস্থাপক বলিয়া তাঁর ভ্রম হইতেছিল যে, সবগুলি দাঁতই নড়বড়্‌ করিতেছে···

এমন সময় পথের পাশেই হেমাঙ্গ সেনের বৈঠকখানার ভিতর হইতে অনেকগুলি লোকের সুপ্রচুর কথাবার্ত্তার আওয়াজ আর উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ তাঁর কানে পৌঁছিল—

কৌতূহলী হইয়া ভগীরথ সেই দিকেই গেলেন···দরজায় দাঁড়াইয়া বিড়ির গন্ধ নাকে পাইয়া তিনি গলার সাড়া দিলেন··· ঢুকিয়া দেখিলেন, অপরিচিত সেখানে কেহ নাই; ফরাসে বসিয়া গ্রামেরই কয়েকটি যুবক গল্প করিতেছে—মহীন্দ্র, ভবভূষণ, কাশীনাথ, সরসী প্রভৃতি।···দু'খানা তক্তাপোষ জুড়িয়া ফরাস পাতা, তিনটা বালিশ গড়াইতেছে; চেয়ার একখানা আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর মানুষ বসিয়া নাই—উচ্ছিষ্ট চায়ের পাত্র, আর চায়ের পাত্রের উপর মাছি রহিয়াছে। চতুষ্পদ একখানা টেবিলের উপর সংবাদপত্র বিছাইয়া তাহার কর্কশ দেহে মসৃণ পরিচ্ছদ পরাণো হইয়াছে। টেবিলের উপর খবরের কাগজের মলাটওয়ালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক দুই পংক্তি সাজানো রহিয়াছে।···মহাত্মা গান্ধির এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্র বাণবিদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ ভাঙা কাঠি গুঁজিয়া গুঁজিয়া বেড়ার সঙ্গে আট্‌কানো রহিয়াছে; বেড়ার সঙ্গেই আট্‌কানো আর একখানা চৌকা কাগজে লেখা রহিয়াছে —স্বাগতম্।

বিড়ির সব ধোঁয়া কেবল জানালা পথে নির্গত হইয়া যায় নাই —অন্য দিকেও তাহা প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়া ভিতরে গন্ধ ছিলই···ভগীরথের নাসারন্ধ্রে তাহা প্রবেশ করিল···কি ভাবিয়া তিনি একবার টানিয়া নিঃশ্বাস লইলেন তাহা কেউ জানে না; কিন্তু মহীন্দ্ররা তাহাতে লজ্জিত হইল; ভাবিল, এটা ওঁর অন্যায়।

মহীন্দ্র বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল—

ভগীরথ বলিলেন—পায়ে মাটি। বলিয়া তক্তাপোষের বাহিরে পা ঝুলাইয়া বসিলেন…বলিলেন,—আজ আমার বড় কুপ্রভাত হে!

যুবকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল: "বাড়ীর সব খবর ভাল ত' ?"

ভগীরথ ওষ্ঠদ্বয় বিস্তৃত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন—

বলিলেন,—হ্যাঁ, সে দিকে খবর ভালই চল্‌ছে। কুপ্রভাত আমার নিজের! বলিয়া আরো একটু হাসিলেন, পরে ঠোঁট্ ফাঁক করিয়া দাঁত দেখাইয়া বলিলেন,—দাঁত একটা পড়্‌ল' আজ!

সমবয়স্ক বন্ধু সদাশিবকে ভগীরথ এই ক্ষতিটা দেখাইতে চান নাই…তখন তুচ্ছ কথায় চটিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু যুবজনসমাজে বসিয়া তাহাকে প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত করিবার কি কারণ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সে মনের কথা তিনিই জানেন।

মহীন্দ্ররা শূন্যতার প্রদর্শনী দেখিয়া হাসিতে লাগিল—

ভগীরথ বলিতে লাগিলেন,—দাঁত পড়ুকগে।…বয়স হলে সবারই পড়ে।…অশুভ উল্কাপাতের মত আমার দাঁত পড়্‌ল ভেবে আমি ভয় পেয়েছি ভেবেছ? রামঃ!—বলিয়া ভগীরথ সবারই মুখের দিকে প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন…তাঁহার অদৃষ্টাকাশে যে উল্কাপাত ঘটে নাই তাহা উহারা বিশ্বাস করিয়াছে কিনা তাহাই যেন তিনি প্রাণপণে দেখিতে লাগিলেন…মনে হইল, কাহারো সে বিশ্বাস নয়—তাহারা আদৌ শঙ্কিত হয় নাই।

ভবভূষণ বলিল,—আজ্ঞে, ঐ যখন নিয়ম, তখন আমাদেরও একদিন পড়বে।

—সদাশিবকেও আমি স্পষ্টই বলে' এলাম তা-ই।…নিশ্চয় তোমাদের পড়বে, একটি দু'টি করে' সবগুলি পড়বে…মুখ দিয়ে কথা জড়িয়ে বেরুবে…পা চল্‌বে না, হাত উঠবে না…কাজের বাইরে যাবি একেবারে।

ভগীরথ থামিলেন—

কিন্তু হাপরের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া তাঁর নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল…

এবং নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত উহাদের মনে হইতে লাগিল, সবাই জানে যে বাঁচিয়া থাকিলে মানুষ বার্দ্ধক্যে অথর্ব্ব হয়—তাহা প্রতিদিনের জানিত সত্য…কিন্তু ভগীরথ এই সাধারণ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা উচ্চারণ করিয়াছেন যেন অভিসম্পাতের অসাধারণ উগ্রতা ঢালিয়া দিয়া!

হঠাৎ শক্ত করিয়া মুঠা বাঁধিয়া ভগীরথ বলিলেন,—খুল্‌তে পারিস্ কেউ?—বলিয়া তিনি ঘুষি চালাইবার মত করিয়া সজোরে তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হাত উহাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন…

ভগীরথের হাড় মোটা নয়—

তাঁহার প্রসারিত শীর্ণ হাতখানা উহাদের চোখের সাম্‌নে এমন করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে দেখিয়া করুণা জন্মে—তাঁহার দুর্ব্বল মুষ্টি খুলিয়া পৌরুষ দেখাইতে কেহ হাত বাড়াইল না…

মহীন্দ্র তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিল,—আমাদের সাধ্য কি খুলি?

সরসীও অক্ষমতার ঐ কথাটাই অন্যভাবে বলিল,—আমাদের কারো সে-ক্ষমতা নেই।

—দেখ্, আমার শক্তি এখনো আছে। নেই? বলিয়া ভগীরথ মুষ্টি সম্বরণ করিলেন।

তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেই মহীন্দ্র পুনরায় বলিল,—আছে বৈ কি।

ভগীরথের পরবর্ত্তী প্রশ্নটা আরো বিস্ময়জনক—

—"আমি যদি এখন বিয়ে করি তবে"—হঠাৎ থামিয়া ভগীরথ নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ...পরক্ষণেই 'তবে'র পর তিনি কেবল উচ্চারণ করিলেন—"কেমন হয়?"

যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত তরুণ দেহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া বিবাহিত জীবনের সুখ-তৃপ্তি-সম্ভোগে তিনি সক্ষম কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি পারিলেন না...উত্তপ্ত প্রাণের আবহ ব্যাপিয়া তাহা ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল...

মহীন্দ্ররা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সমস্বরে বলিল,—তা' ভালই হয়।

ভগীরথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—পারি কিনা?

অর্থাৎ দন্তস্খলনের পরও এই বয়সে বিবাহে পরছিদ্রান্বেষী সমাজের অনুমতি আছে কিনা?

মহীন্দ্র বলিল,—খুব পারেন।

অর্থাৎ পরচর্চ্চানুরক্ত সমাজের অনুমতি অবশ্যই আছে।

—"তা-ই বল্ রে তোরা।"—পরমোৎসাহের সহিত এই কথা বলিবার পর ভগীরথের বুকের গুরুভার যেন নামিয়া গেল—তাঁহাকে আর কিছু না হোক, কিঞ্চিৎ নমনীয় দেখাইল।

যা'হো [illegible] কথা যখন একটা শান্তধারায় প্রবাহোন্মুখ [illegible] ক শ্যালকের হাত ধরিয়া বৈদ্যনাথ সাহা [illegible] পরিয়া দেখা দিল…

—আসুন [illegible] ? আছেন কেমন ?… ইত্যাদি প্রশ্নে [illegible] বৈদ্যনাথ সাহার জামাতার হাত ধরিয়া ঝাঁকি [illegible]

জামাই জুতা [illegible]

বলিল,—কা'ল [illegible]

ভগীরথ যে সম্মু [illegible] রসীর মনে ছিল—সংযমের সহিত বলিল, [illegible] খন ?

জামাই হাসিয়া নিঃ [illegible]

কিন্তু ভগীরথের কা [illegible] বেশ করে নাই—তিনি নির্নিমেষ চক্ষে জ [illegible] ছিলেন…ইহার যৌবন যেন আরো ভরাট্‌, [illegible]

জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনি [illegible]

জামাই নিজের পরিচয় দি [illegible] —বদ্যিনাথের জামাই।

জামাই হিসাবে এবং শিক্ষি [illegible] গণ্যমান্য আপনি আজ্ঞার পাত্র, কিন্তু এখ [illegible] নের ধামা হাট হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত টানে বলি [illegible]

ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত [illegible] করো ?

মহীন্দ্র প্রভৃতির স্বভাবতঃই ইচ্ছা হই [illegible]

আসর যখন নূতনত্ব লাভ করিয়া [illegible] তখন ভগীরথ উঠিলেই ভাল হয়···এ[illegible] ছিলেন ত' কেবল !

ভগীরথের প্রশ্নের উত্তরে [illegible] কাতায় আমাদের আড়ত আছে।

—কি নাম তোমার ?

—শ্রীবুদ্ধদেব সাহা।

—বয়স কত তোমার ?

—এই বাইশ।

বাইশে কি বিষ [illegible] ভগীরথ জামাইয়ের ঐ উত্তরের পরই ছ[illegible] বলিয়া বসিলেন,—বাবা, এ ফূর্তি থাকবে [illegible] বেয়াল্লিশ হবে—বেয়াল্লিশ থেকে [illegible] —বলিয়া কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি [illegible] তাহা একটুও বুঝা গেল না।

বুদ্ধদেব [illegible] বলিল,—যে আজ্ঞে, তা' হবে···কেউ [illegible]

—[illegible] আছে অস্বীকার করে ? ···ওহে [illegible] বছরের ছিলাম—কিসের কি [illegible]

[illegible] হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন···

তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে

শ্রীচন্দ্রগুরের বঙ্কু গুঁই বিবাহ করিবে না বলিয়াই মনে করিয়া বসিয়া ছিল; কিন্তু বিবাহ তাহাকে করিতেই হইল। এটা বঙ্কুর দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা।

বঙ্কু বিশ্বাসঘাতক নহে—চপল ত' নহেই; উপরন্তু স্ত্রী-সম্পর্কে যাবজ্জীবনব্যাপী একটা ঢল-ঢল দ্রব ভাব আর গুণগ্রহিষ্ণুতাই যেমন তার চির-প্রতিপাল্য মৃদুতার কারণ, তেম্‌নি তার একনিষ্ঠারও ভিত্তি। পরের গুণ উপলব্ধি করিয়া অতি মাত্রায় বিগলিত আর নমনীয় হইয়া পোষ মানিয়া যাওয়ায় তার ঐহিক কি ইষ্ট লাভ হইয়াছে, মনের কি মান বাড়িয়াছে, তাহা খুঁজিতে গেলে অনেক খুঁজিতে হইবে—তথাপি সারবান কিছু পাওয়া যাইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে; তার উপর বঙ্কুর প্রাণে এত দীপ্তি নাই যে, প্রবহমান বিগত অনুভূতিপুঞ্জকে দিবারাত্র চোখের সম্মুখে ভাসাইয়া রাখিয়া তার অমৃতত্বের স্বাদগ্রহণ আর নিগূঢ় অর্থসুখ সম্ভোগ করিবে, অথবা অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। বঙ্কু পূজারীও নহে, সাহসীও নহে।

স্ত্রীর ধমক খাইয়া বঙ্কুর মনে হইত, এ তৃষ্ণার সময় জল দেয়, সুতরাং ধমকে দুঃখের কি আছে?

তারপরই সে জলের কথাও ভুলিয়া যাইত, ধমকের কথাও

ভুলিয়া যাইত। বেদনা বহন করিবার মত বিপুল বক্ষ বঙ্কুর নাই।

কিন্তু প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর কথা তার সমগ্রভাবে মনে আছে—যেমন একটি পিণ্ডাকার অদ্ভুত বস্তুর কথা মানুষের দৈবাৎ মনে থাকিতে পারে।···মনে থাকিতেই সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল··· দ্বিতীয়া গিরিজাকে বিবাহ করিয়াও সে প্রথমা গুণবতীকে ভুলিল না···এবং না ভুলিতেই একটি পুত্র সন্তান গিরিজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল।

পাইয়া স্ত্রী বর্ত্তিয়া যাইবে এমন স্বামী বঙ্কু গুঁই কদাপি নয়। তার আর্থিক অবস্থা আর দৈহিক রূপ দুই-ই অস্বচ্ছল—মোটেই চিত্তাকর্ষক নহে। বঙ্কু গুঁইয়ের সম্মুখীন হইয়া তটস্থ হইয়া থাকা দূরের কথা, আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিবার প্রয়োজনীয়তা আজ পর্য্যন্ত কেহ অনুভব করিয়াছে বলিয়া জানা নাই।

বঙ্কু নিস্তেজ—গাঢ় আস্তরণে আবৃত জ্যোতিঃ-আধারের মত নিস্তেজ নহে; পূর্ণায়তন অথচ শুষ্ক যে বীজটিকে দেখিলে মনে হয়, ইহার গর্ভকোষে সে প্রাণসত্তা নাই যাহা আপন আনন্দের বেগে অঙ্কুর-আকারে বিকশিত হইয়া উঠে—সেই বীজটির মত সে নিস্তেজ।

বঙ্কুর জীবন-যাত্রা অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা পরিব্যাপ্তিহীন মসৃণ প্রাত্যহিকতা—নিত্য নব সম্ভাবনায় তাহা চঞ্চল, উদ্‌গ্রীব, শিহরিত নহে।

বর্ত্তমানের স্পর্শের ভিতর হইতেও বঙ্কু যেন নিজেকে গুটাইয়া

লইয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে—লোকে তা-ই তাহাকে বলে পুরাতন। বাহিরের লোকের কাছে বঙ্কু চিরকালই সেকেলে বলিয়া পরিচিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার তাড়াতাড়ি নড়িতে পারে, জিহ্বা যার কারণে অকারণে আন্দোলিত হইতে জানে, দৃষ্টি যার ছুটিতে ভোলে না, দশজনের কাছে যার যাতায়াত আছে, ব্যসনে যে আনন্দ পায়, সে বুড়া হইলেও তার বৃদ্ধত্বের আবহাওয়া লোকে অনুভব করিতেই পারে না; কিন্তু বঙ্কুর সে স্বভাবই নয়। নিজেকে একান্তভাবে জড়ো করিয়া লইয়া চিরদিন সে গৃহকোণে বসিয়া কাটাইয়াছে বলিয়া চঞ্চল-বিহারী পৃথিবী তাহাকে তাহার নিজের অচঞ্চলতার গভীরেই যেন সমাধিস্থ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। বঙ্কু বুড়া নয় ত' বুড়া কে? মরা পুড়াইতেও তার স্বজাতিরা তাহাকে ডাকে না।

স্বামীর যৌবনকালের স্ত্রী ছিল বলিয়া প্রথমা গুণবতী দ্বিতীয়া গিরিজার বুক ঈর্ষানলে দগ্ধ করিতেছে ইহা সত্য নহে। গিরিজা শুনিয়াছে, গুণবতীর স্মরণীয় যত গুণই থাক্ তার রূপ ছিল না —অর্থাৎ, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যাস্থিত মৃগের মত স্বামীকে নিজের রূপমণ্ডলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত করিয়া সে তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-সুরা পান করাইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কুর সহিত পরিচিত হইতেই গিরিজার সন্দেহ রহিল না যে, স্বামী কস্মিন্‌কালে এখনকার চাইতে এক-কলা বেশী উজ্জ্বল ছিলেন—কোনদিন ওঁর প্রাণের উল্লাস তীর অতিক্রম করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে; আর, স্ত্রী-প্রীতি ওঁর যতই থাক্, অত্যন্ত মোটা আর তৃতীয় শ্রেণীর

বাস্তব জিনিষ অশন ও বসন ব্যতীত অতি অকারণ, স্পষ্ট এবং সূক্ষ্মোপভোগ্য আনন্দের মাল্যভূষণ উপহার দিতে উনি সক্ষম হইয়াছেন।

তথাপি, এ সম্মান আর আত্মদানের গৌরব গুণবতী আর বঙ্কুকে দিতে হইবে যে, সময়ের সোপানে তাহারা সমচ্ছন্দে পা ফেলিয়া দীর্ঘ দিনের, সুস্বাদু সহচরী ও সহচর হিসাবে না হোক্, সাহচর্য্যের সুষ্ঠু একটা জ্ঞানসহ তিলে তিলে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছিল।

প্রৌঢ় বয়সে একটি সাত বৎসরের পুত্র এবং স্বামীকে রাখিয়া গুণবতী মারা গেল। গুণবতী মরিবার সময় বলিয়া গেল—"ছেলের মুখ দেখে' ম'লাম; এই আমার ঢের। আশা ত' ছিলই না"...

কিন্তু বলিল না যে, হাতে শঙ্খ আর মাথায় সিঁদুর লইয়া গেলাম—ইহাই আমার সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।

গুণবতীর শ্রাদ্ধ-বাসরেই একটা গুঞ্জন শুনা গেল...বঙ্কুর দ্বিতীয় বার বিবাহ করা কর্ত্তব্য, ইহাই সেই গুঞ্জনের উপজীব্য। না দেখিয়া দেখিয়া বঙ্কুকে যাহারা ভুলিতে বসিয়াছিল তাহারা ভোজে বসিয়া লুচির সঙ্গে বঙ্কুকে বন্ধুর চোখে দেখিল...

শ্রাদ্ধের ভোজ চলিতেছিল গুণবতীর মৃত্যুর একমাস পরে; সুতরাং শোক পুরাতন এবং নির্জ্জীব হইয়া আসিয়াছে—অর্থাৎ দাগ থাকিলেও ক্ষত নাই—মনে করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ অম্বুজাক্ষ বলিলেন,—ছেলেটাকে যত্ন ক'রবার লোক রইল না...

কথাটায় গভীরতা কিছুই নাই; তবু কথাটা বলিয়া আর কে কি বলে শুনিবার জন্য অম্বুজাক্ষ মনোযোগী হইলেন...

মহেশ বলিল,—বন্ধু ত' ঐ! নিজেকেই ভুলে' আছে··· ছেলের কথা ত' ছেলের মায়ের সঙ্গেই ঢুকে' গেছে।

মহেশের এই কথায় মাতৃহীন সন্তানের অসহায় অবস্থাটা খুবই নির্দ্দয় আর স্বচ্ছ হইয়া আসিল।

মাধব বলিল,—হ'লেই হ'ল ···মেয়ে ত' আমিই তিনটি দিতে পারি। বলিয়া ঢোক্ গিলিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ হইয়া মাধব পুনরায় বলিল,—এক সারিতে সাজিয়ে এনে।

বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব নাই; একটির দরকার হইলে তিনটি, অর্থাৎ বাহুল্যভাবেই তাহাদের পাওয়া যাইতে পারে এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া বন্ধুর পুত্রের হিতৈষীগণ পুলকিত হইয়া লুচির সঙ্গে প্রচুর হাস্য করিলেন···

কিন্তু বন্ধু গুণবতীকে ভুলিতে পারেন নাই—সকাতরে বলিল,—আপনারা আমাকে ঐ আদেশটা করবেন না।

অনুনয়ে নম্র কিন্তু বিরুদ্ধ উক্তি শুনিয়া অম্বুজাক্ষের কণ্ঠ অধিকতর সজীব হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন করবে না?···স্বর্গীয়া তোমার কেমন স্ত্রী ছিল তা' আমরা জানি।··· চাবি হারিয়ে গেলে মানুষ আবার চাবি আনে, না বাক্স ফেলে দেয়? কি করে?···ছেলেটাকে মানুষ ক'রতে হবে না?

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু পরাস্ত হইয়া গেল—

'ঐ ত' বিপদ!' বলিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

মাধব বলিল,—অমন বিপদে পড়ার কি দরকার?···ছেলের একটী মা চাই-ই; চাইনে? বলিয়া একেবারে বন্ধুর চোখের উপর দৃষ্টি ফেলিল···

এ দৃষ্টির অর্থ—নির্ব্বোধ, তুমি ধ্বংসের দিকে চলিয়াছ; এখনও সাবধান হও, নতুবা…

বন্ধু থতমত খাইয়া গেল—

মাথা চুলকাইয়া বলিল,—দেখতে গেলে চাই বই কি; কিন্তু মনে যে ভাবতে পারিনে!

অম্বুজাক্ষ বলিলেন,—পাগল…

মহেশ বলিল,—অবাক্ করলে!…শোককে আগলে' বসে' নিজের কথা ভাববার দায় তোমার এখন তেমন নাই; কিন্তু ছেলের কথা তোমাকে ভাবতেই হবে…তাকে ত' মেরে ফেল্‌তে পার না!

শুনিয়া বন্ধু শিহরিয়া উঠিল।

আত্মরঞ্জনের অর্থাৎ স্ত্রীর স্মৃতিপূজার নিরর্থক বলিয়া হাস্যকর উদ্দেশ্যে পুত্র সংরক্ষণের কৃচ্ছ্রতা ভোগে অর্থাৎ বিবাহে অনিচ্ছার দরুণ বন্ধু ভৎর্সিত হইয়া মাথা নামাইয়া রহিল…

তারপর, ভোজন করিতে করিতে ওঁদের অনেক কথাই হইল…

মানব জাতির যেন আদৌ বংশধর নাই, সব লোপ পাইয়াছে, এমনি একটা দুস্তর ও দুঃসহ ঘটনা অকারণেই কল্পনা করিয়া লইয়া নির্ব্বংশ হইবার নানা কারণ, নানা ফল, মানুষের নানা দুর্গতির আলোচনা হইল…পিণ্ডলোপের বীভৎসতা, তিল-জলের অভাবে পরলোকগত তৃষিত আত্মার হাহাকার তাঁহারা এমন নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিলেন যেন ঐ সব তাঁহারা জীবন্ত আলোকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন…পূর্ব্বপুরুষকে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়

ঘুণাক্ষরেও বঞ্চিত করিলে কত জন্ম নরকস্থ হইয়া থাকিতে হয় তাহাও নির্ণীত হইল···

যাহারা এ-সব তত্ত্ব জানিত না তাহারা বিশেষভাবে অবগত এবং অবাক্ হইল···যাহারা জানিত তাহারা আরও নিঃসন্দেহ হইয়া গেল—

এবং সকলে মিলিয়া করুণ-নেত্রে তাকাইয়া রহিল বঙ্কুর দিকে —যেন, পিণ্ডদাতা যাহাদের নাই বঙ্কু তাহাদের সকলের প্রতিনিধি ···পরলোকের কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া উঁহাদের কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে···তাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ উঁহাদের খুবই আছে, কিন্তু ক্ষমতায় বোধ হয় কুলাইবে না···

ঐ সংশয়গ্রস্ত অবস্থায় উঁহারা ভোজন শেষ করিয়া উঠিলেন··· ক্রমশঃ প্রস্থান করিলেন; কিন্তু ক্ষীণমস্তিষ্ক আর দুর্ব্বলচিত্ত বঙ্কুর সম্মুখে জাগিয়া রহিল, যেমন করিয়া জাগে আলোকশূন্য শব্দশূন্য একটা রাত্রি, তেম্‌নি ভীষণ পুত্রশূন্য একটা পৃথিবী···

যত্ন না পাইয়া, জলের অভাবে শিশু-বৃক্ষটীর মত, পুত্র শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে···

সুতরাং দশজনের কথায় আর পুত্রের পালনার্থে বঙ্কু পুনরায় বিবাহ করিল—মাধব সারি দিয়া সাজান' যে তিনটি মেয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদেরই একটীকে।

অল্প দিনেই দেখা গেল, গিরিজা অসামান্য একটা সপ্রতিভতা, আর আত্মপ্রকাশের বাঞ্ছা ও উদ্যম লইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।···বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পিছাইয়া থাকিবার

দিকেই একটা ধিক্ ধিক্ আকর্ষণ বোধ হয় থাকে ; কিন্তু গিরিজা সোজা সম্মুখের দিকে সটান্ আগাইয়া গেল। চোখ ঝল্সান রূপ তারও নাই, চমক্-লাগান বুদ্ধিও তার পরিস্ফুট হইল না ; কিন্তু দেখা গেল, জলের গতি যে মাঝি চেনে তাহারই মত সে অনায়াসকুশলী—প্রবীণা গৃহিণীর মত গাম্ভীর্য্যের সহিত সে বাড়ী-ঘরের চেহারা ফিরাইয়া পরের চোখে না পড়িয়া পারে না এমনি ঝক্‌মকে করিয়া তুলিল—শুধু ঝাঁটার জোরে নহে ; গৃহস্থালী গুছাইয়া তুলিতে ব্যবহারে যে সংযম আর পরার্থপরতার প্রয়োজন তাহাও তাহার আছে বলিয়াই স্বীকৃত হইল। যার চোখে কিছু এড়ায় না এবং যার কিছুই নিখুঁত মনে হয় না শ্রীপতির সেই দুর্জ্জয় মা-ও বলিল : "মেয়ের শিক্ষে ভাল।"

বুঝাই গেল না, নিজের যৌবনকে সে ধিক্কৃত করে কিনা, মন তার অদৃষ্টকে গালি পাড়ে কিনা…কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠিল সুন্দর এই সত্যটাই যে, যৌবনের উত্তাপে বিব্রত বোধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশকে আহ্বান করিবার রুচি তাহার নাই। গিরিজা যথার্থ ভদ্র বধূ।

নন্দ মা বলিয়া ডাকে—তাহাতে গিরিজা গদগদ হয় না, আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানও করে না, অর্থাৎ সে স্বাভাবিক।

কিন্তু তাহার মনে হয়, স্বামী যেন নিজেকে অত্যন্ত অন্তরালে রাখিয়া তাহাকে আর তাহার সপত্নী-পুত্র নন্দকে এক ঠাঁই করিয়া একটা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন…

দেখিয়া দেখিয়া গিরিজা একদিন বলিল,—আমার সতীনের ছেলের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন তা' গোপনে লক্ষ্য করবার

দরকার নেই। আমাকে বাদ দিয়ে ছেলের আচরণেই তা' স্পষ্ট টের পাবে…আর, পাড়ার লোককে বলে' দিও, ছেলেকে ডেকে পরামর্শ দে'য়ার চাইতে চুপ করে' দেখে' যাওয়াটাই ভাল। তোমরা ষড়যন্ত্র করে' ছেলেকে পর করে' দিও না—তা হলেই যথেষ্ট হবে …তার পরের ভার আমার উপর। মোটামুটি দেখে যাও।

আদেশ শুনিয়া বঙ্কু কুঁকড়াইয়া গেল…চোখ দু'টি তাহার বারকতক পিট্ পিট্ করিল…মনে হইল, অন্যায় হইয়াছে…তারপর তাহার মনে হইল, টক্‌টা বেশ রাঁধে—ভাতে রুচি হইতেছে।

পাড়ার মেয়েরা তাহাকে অবিরাম চোখ কান খোলা রাখিতে বলিয়া দিয়াছে…ছেলেকে তাহার মামার বাড়ীতে চালান করিয়া দিবার পরামর্শও কেহ কেহ দিয়াছিল—

শুনিয়া বঙ্কুর মনে হইয়াছিল, এ কেমন হইল! বিবাহ না করিলে এক বিপদ, করিলে অন্য বিপদ!…কিন্তু বঙ্কু মুখে বলিয়াছিল, দেখি কিছুদিন। কিন্তু সেই কিছুদিনের দু'একদিন না যাইতেই তাহার দেখা ধরা পড়িয়া গেল—বঙ্কু চোখ ফিরাইল।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মানুষ একটু বাড়াবাড়ি আদরে রাখিতে চায় বলিয়া হাসির সঙ্গে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে…কিন্তু সে আদর বোধ হয় অনুশোচনার কণ্টকোৎপাটন—প্রথমার প্রতি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একদা যে অনাদর দেখান' হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে, তাহারই বেদনা ক্ষয় করিবার আগ্রহ এটা। কিন্তু বঙ্কুর স্বকৃত এমন কোনো ঘটনার কথাই মনে পড়ে না যাহার আঘাতে গুণবতী ব্যথা পাইয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে। বঙ্কুর

আদরে বাড়াবাড়ি নাই। এই অকপটতায় গিরিজা সুখী হয়—কিন্তু সহ্য হয় না তাহার যাহাদের স্বামী বৃদ্ধ নয় তাহাদের আকাশ-ভরা গল্পগুলি। তাহারা যেন বলিতে চায়, যে-সুখের তৃষ্ণায় পৃথিবীর অপরাপর মানুষ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে চোখ উল্টাইয়া হিক্কা তুলিয়া মরিতেছে, সেই সুখের নাগাল, এই দেখ, আমরা পাইয়াছি। তাহাদের রসনার তীব্র উল্লাস আর চোখের উচ্ছল ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, আনন্দ যেন ফোয়ারার মত সাত রঙের বিজলী খেলাইয়া ঝলকে ঝলকে বাহির হইতেছে…বুকে সাগর থই থই করিতেছে…কোথাও তার কূল নাই, কোথাও কঠিন দ্বীপ-মৃত্তিকা চোখে পড়িয়া রসভঙ্গ ঘটিতেছে না—কেবলি একটা একটানা গাঢ়চ্ছন্দ উন্মত্ত কলরোল ধ্বনিত হইতেছে…এই আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরাও যেন সুখের।

কিন্তু গিরিজার মনে হয়, কোথায় যেন ইহারা একটা শুভ সুষ্ঠু নীতিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে…কেবল শান্ত বন্ধনবোধই যার একমাত্র স্বাদ তাহাকেই ফেনাইয়া তুলিয়া যেন ইহারা সুরার মত একটা উগ্র অস্বাস্থ্যকর আর উত্তেজক রসায়নে পরিণত করিয়া লইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া চক্ষু, রক্ত আর অঙ্গকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে…পরিপূর্ণতার মূর্ত্তি ইহা নহে, ইহা স্ফীতি, অতিরিক্ততা; প্রদাহকে ইহারা সুখ মনে করিতেছে।…অন্তরঙ্গ-ভাবে পরস্পর মিশিয়া যাওয়াই কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনের চরম সার্থকতা নহে? তাহার অতিরিক্ত যাহা তাহা কি বন্যার বাড়তি জলের মত অকল্যাণকর নহে? একদিন…

কিন্তু সে কথা না বলাই ভাল—অভিসম্পাতের মত শুনায়।

তথাপি সেই কথাগুলিই গিরিজা না ভাবিয়া পারে না···ভাবিতে ভাবিতেই ভাবনাকে চাপা দিবার জন্য এক সময় সে চম্‌কিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠে!

স্বামী বৃদ্ধ, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? নেশার ঘোরে দিবা-স্বপ্ন দেখিয়া যাহারা মনে করে, ইহাই সত্য, ইহাই সুখ, ইহাই শেষ আর ইহাই সার্থকতা, তাহারা কৃপার পাত্র। অপরাহ্ণের সূর্য্য কি সূর্য্য নয়?···কিশোরী রাধিকা কেবল প্রেমিকা, কিন্তু উমা শিবানী—তপস্যার দ্বারা তিনি মহেশ্বরী। কে বড়? বড় শিবানীই—তাঁহাকে বুঝিতে হাত ঘুরাইয়া নাক দেখাইতে হয় না, অর্থাৎ তিনি অতি সরল নির্ব্বিকার নির্ম্মল ভক্তি-সাধনাতেই চিরমধুর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভাবিয়া গিরিজা সন্তুষ্ট হয়।

নন্দ জিজ্ঞাসা করে,—মা, আমার সে মা ত' মরে' গেছে—আর আস্‌বে না বুঝি?

গিরিজা বলে,—আমিই ত' এসেছি তোর মা হ'য়ে। আমি তোর সেই মা-ই।

নন্দ তাহার মুখের দিকে নির্ণিমেষ চোখে চাহিয়া কি যেন অনুসন্ধান করে···তারপর কি বুঝিয়া সে চুপ করিয়া থাকে তাহা বুঝা যায় না; কিন্তু গিরিজার বুকের ভিতরটা টন্‌-টন্‌ করে।

ওদিকে, বঙ্কু স্ত্রীকে সুখেই রাখিয়াছে বলিতে হইবে, গরমিল ঘটাইবার লোক সে নয়—সে সাহসই তাহার নাই; নন্দকে প্রহরা দিয়া রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা অকারণ বুঝিয়া সে ত্যাগ করিয়াছে।

নন্দ বলিতে দু'জনাই অজ্ঞান—

এমন সময় গিরিজা গর্ভবতী হইল···তাহার একটি পুত্র জন্মিল ···এবং পুত্র জন্মিতেই অশেষ আরামের সঙ্গে দেখা গেল যে, বন্ধুর সঙ্গে তাহার বয়সের পার্থক্যটা লোকের সম্মুখ হইতে আপনিই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পুত্রের জনক আর জননী তাহারা— দু'টি নদীর একত্র মিশ্রণের মত এই স্বাভাবিক সংযোগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিসাবী কলম বয়সের বাঁধ বাঁধিতে কেন আসিবে?··· পড়্শীরা গুণবতীকে ডাকিত নন্দ'র মা বলিয়া, গিরিজাকে ডাকিতে লাগিল চন্দরের মা বলিয়া—অর্থাৎ এই সংসারের চক্ষুতে গুণবতী যে স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, চন্দরের মাকেও তাহারা পুনরায় সেই আসনেই নির্ব্বিবাদে বসাইয়া দিয়াছে, সুতরাং বয়সের হিসাব এখন কেবল অবান্তর নহে, অশুভ ক্রূরভাষণ। যে মা হইয়াছে তাহার পরিচয় কেবল মা—স্ত্রীর দেহ তখন, স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের তুলনায় মর্ত্ত্যের মত, নিম্নতর স্তরের জিনিষ; স্বামীর সঙ্গ-চিন্তা তখন কেন্দ্রচ্যুত, পতনশীল।

নন্দ চন্দরের অত্যন্ত অনুগত বাহন—

বন্ধু বলে,—ছেলেটাকে মারবে টেনে টেনে—প্রাণ বা'র করে' দিলে।···ওগো, দেখে যাও কি ক'রছে।

নন্দ তখন চন্দরকে কাঁখে তুলিতে অক্ষম হইয়া তাহার ডানা দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে হাঁটু বরাবর ঝুলাইয়া ধরিয়াছে, আর উপরের দিকে প্রাণপণে টানিতেছে···

বন্ধুর ডাকে গিরিজা দৌড়াইয়া আসিয়া দৃশ্য দেখিয়া

হাসিতে লাগিল···বলিল, তুমি উঠে' এসে একটু সাহায্য করতে পারলে না! ছেলেটা ঘেমে হাঁপিয়ে উঠেছে। বলিয়া চন্দরকে নন্দর কাঁখে তুলিয়া দিয়া জুৎ করিয়া বসাইয়া দিল; তারপর নন্দর মুখের আর গায়ের ঘাম আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল।

নন্দ বলিল,—এইবার হয়েছে। বলিয়া সে চন্দরের কোমর বাঁ হাত দিয়া বেড়িয়া বাগাইয়া ধরিল···

বঙ্কু বলে,—ওটাও তেম্‌নি! অত টানাটানিতেও কান্না নেই! ···ওরে, ঘুরিস্‌নে অমন করে'···ওটার ভারে তুই পড়্‌বি টলে', আর ও দেবে বমি করে'।

তিনবার পাক্ খাইবার পর নন্দ বাপের ঐ হৈ-হৈ নিষেধে দাঁড়াইল—চন্দর তখন হাসিতেছে···

গিরিজা তাকাইয়া তাকাইয়া তাহা দেখিতে লাগিল—

বঙ্কু তাকাইয়া তাকাইয়া তাহা দেখিতে লাগিল।

চন্দর এখন ছয় বছরের। শৈশবে সে অত্যন্ত মোটা ছিল,—এখন তাহার একহারা চেহারা দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছে।

ইতিমধ্যে গিরিজার একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া সূতিকাগারেই মারা গিয়াছে···আর হয় নাই।

বঙ্কুর শরীর আরো খারাপ হইয়া গিয়াছে; তাহার দেহের চর্ম্ম লোল হইয়া আসিতেছে—তাহা তাকাইলেই চোখে পড়ে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকার হয় না; গাল আরো চুপ্‌সিয়া গিয়াছে; দাঁত আরও কয়েকটি পড়িয়া গিয়াছে; নিদ্রার প্রভাব দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে; মাথাটা ঝুঁকিয়া থাকে···

কিন্তু বঙ্কু অন্তরে সুখী—গিরিজার গুণে আর সেবায় সে সুখী; নন্দ আর চন্দরের সমান যত্ন হইতেছে দেখিয়া সে সুখী; দেহের সামর্থ্যগত আর কামনাগত অনৈক্য যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে আবিল করিতে পারে এ চিন্তা তাহার মনে কখনও জাগে নাই বলিয়া সে সুখী। গিরিজা নিজেই তা' স্বীকার করে না—অপরকে জানিতে দিবে কি!

বঙ্কুর মাঝে মাঝে অসুখ করে—শরীরের উত্তাপ একটু বৃদ্ধি পায়, বোধ হয় জ্বরই হয়—পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় কোমর আর হাত-পায়ের অস্থিসন্ধিগুলি কন্ কন্ করে···

তার সেইটুকু অসুস্থতা দূর করিতে কবিরাজ মহাশয় একদিন অন্তর একদিন বৈকালে একমাত্রা মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আজ দু'দিন বঙ্কুর তেমনি অসুখ করিয়াছে—

বৈকালে খলে মকরধ্বজ মাড়িয়া লইয়া গিরিজা তাহার বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল—

বঙ্কু শুইয়া ছিল, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল···চাহিয়া তাহার মনে হইল, স্ত্রীর মুখাবয়ব যেন ভাল করিয়া চোখে পড়িতেছে না। ···বেলাশেষের স্তিমিত আলোক ঘরের ভিতর আরও স্বল্প-জ্যোতিঃ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর মুখাবয়ব ভাল করিয়া চোখে না পড়িবার কারণ তাহা নহে—

বঙ্কুর মনে হইল, তাহার চোখের সামনে যেন দ্রুত-কম্পনশীল একটা বাষ্পীয় যবনিকা রহিয়াছে···নিম্নের বায়ুর ভিতর হইতে তরঙ্গে তরঙ্গে উত্থিত হইয়া তাহা ঊর্দ্ধের বায়ুর ভিতর মিলাইয়া যাইতেছে···

তাহার আর গিরিজার মাঝখানে ঐ তরল অস্বচ্ছতা হঠাৎ দুস্তর মনে হইয়া বঙ্কুর যেন অসহ্য হইয়া উঠিল…তাড়াতাড়ি চোখের উপর আঙুল বুলাইয়া সে উঠিয়া বসিল ; হাত বাড়াইয়া বলিল,—ওষুদ এনেছ ? দাও। বলিয়া আবার তাহার মুখের দিকে চাহিল—এবার মুখ তার স্পষ্ট দেখা গেল…

মুখে সুন্দর একটি কলরবহীন নিরুত্তেজক শান্তশ্রী—এই আসন্ন সন্ধ্যার বর্ণ নয়, তার প্রতিবিম্বিত আভার ম্লানিমা যেন সেখানে ফুটিয়া আছে…

নিবিড় সেবায় অক্লান্ত হাতখানি বাড়াইয়া গিরিজা ঔষধের খল তাহার দিকে আগাইয়া ধরিল…বঙ্কুর ইচ্ছা হইল, সেই হাত-খানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতের উপরেই ঢলিয়া পড়িয়া আর অশ্রু ঢালিয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে—

কিন্তু তাহা সে করিল না—

মনে মনে বলিল : "ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং"—বলিয়া হাত বাড়াইয়া খল লইয়া মধু-মিশ্রিত মকরধ্বজ চাটিয়া চাটিয়া খাইতে লাগিল…

বঙ্কু খল হাতে ধরিয়াই আছে এমন সময় বাহিরে রাস্তায় একাধিক তীব্র কণ্ঠস্বর শুনা গেল…ছেলেরা ঝগড়া করিতেছে।

স্ত্রীর হাতে খল দিয়া বঙ্কু বলিল,—চন্দর কোথায় ?

গিরিজা বলিল,—খেল্‌তে বেরিয়েছে।

—ঝগড়ার মধ্যে সে নেই ত' ?

ছিল, কারণ বঙ্কুর মুখের কথা শেষ হইতেই উহাদের কানে আসিল, একটি ছেলে বলিতেছে,—চন্দর না হন্দর…

শুনিয়া অন্যান্য বালকেরা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল··· ওরা স্বামী-স্ত্রী উদ্‌গ্রীব হইল···

বঙ্কু বিছানায় বসিয়াই ডাকিল,—চন্দর···

কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠের সে ডাক কেবল চন্দরের মা গিরিজার কান পর্য্যন্ত গেল···

তখনই সেই ছেলেটি আবার বলিল,—দেমাক্‌ দেখ! বুড়োর বেটা। চন্দর তার বাবার নাতি, জানিস্‌ তোরা?

ছেলেগুলি আবার হাসিয়া উঠিল···তারপর আরও সব কি কি বলিতে বলিতে বালকের দল দূরে চলিয়া গেল ··

চন্দর ঘরে ঢুকিল—

বঙ্কু তখন চোখ নামাইয়া রহিয়াছে—

গিরিজার চোখ জ্বালা করিতেছে—

বঙ্কু তখন কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীর্ণতার সঙ্গে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে···গিরিজা তার দ্বাবিংশতি বর্ষের একটি অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘুর্‌পাক খাইতেছে···

— শেষ —

জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

উদয়-লেখা
বিনোদিনী
শ্রীমতী
রূপের বাহিরে
উপায়ন
শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী
রোমন্থন
দুলালের দোলা
মহিষী

অসাধু সিদ্ধার্থ
লঘু-গুরু
তাতল সৈকতে
রতি ও বিরতি
স্মৃতিনী
যথাক্রমে
এবং
অক্ষরা (কবিতার বই)
মূল্য মাত্র দেড় আনা

শীঘ্রই বাহির হইবে :—

তুলসী
(কাব্যোপাখ্যান ও কৌতুক-কবিতার সমষ্টি)

দাসী
("দাসী"র রূপ ও রস কেমন সুখদ তাহা দেখিবেন)